প্রেম প্রতিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আনন্দ সাগরে।

উপেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে গৃহে চলিয়াছেন, শারদীয়া পূজার আর দুই দিবস মাত্র বিলম্ব আছে, আজ বঙ্গের সুখের পঞ্চমী। দাসত্ব-পীড়িত বাঙ্গালি-জীবনে আজ আর আনন্দের সীমা নাই। প্রবাসবাসী বাঙ্গালি এই দিনে আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিয়া প্রবাসের সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়। অতি প্রত্যূষে উপেন্দ্রনাথ খুল্লতাতপুত্র ধীরেন্দ্রনাথ এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া কলিকাতার পটলডাঙ্গার বাসা হইতে সিয়ালদহের ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশন লোকের ভয়ঙ্কর জনতা এবং কোলাহলে পরিপূর্ণ; টিকিট ঘরের সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা লোকের ভিড়; টিকিট ক্রয় করা দুসাধ্য। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা সকলে একেবারে ব্যতি-ব্যস্ত। এই সকল জনতার মধ্যে অনেক জুয়াচোর প্রবেশ করিয়া আপনা-পন অভিলাষ পূর্ণ করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। কেহ আপনার দ্রব্যাদির ওজন দিতেছে, কেহ বা দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, কেহ টিকিট ক্রয় করিতেছে,কেহ কোন সঙ্গীর প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে,এবং মনে মনে তাহাকে গালি দিতেছে; এইরূপ সকলেই এক একটি কার্য্যে ব্যস্ত। উপেন্দ্রনাথকে এইখানে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইল না; তাঁহার ভ্রাতা ধীরেন্দ্র এবং ভৃত্য সকল আবশ্যকীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিল। গাড়ি ছাড়িবার আর দশ মিনিট বিলম্ব আছে,উপেন্দ্রনাথ ধীরেন্দ্রও ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিলেন।

গাড়িতে বসিবার তিলার্দ্ধ স্থান নাই, সকল গাড়িই লোকে পরিপূর্ণ, কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক গাড়িতে উঠিতে পারিলেই আজ সকলে সন্তুষ্ট।

সকলের মন গৃহে যাইবার জন্য এরূপ উৎসুক যে গাড়ি ছাড়িবার যে দশ মিনিট বিলম্ব আছে সে বিলম্বও কাহার সহ্য হয় না; কেহ পত্নীর প্রণয়ের বিষয়, কেহ জননীর স্নেহের বিষয়, কেহ আত্মীয় স্বজনের যত্নের বিষয় ভাবিয়া একবারে আনন্দে অধীর হইতেছে; অনেকেরই প্রিয়তমার মুখ মনে পড়িতেছে। আবার কেহ কেহ প্রিয়তমার ফরমাসী দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন নাই বলিয়া এখন তাহার আনন্দ সাগরে দুঃখের তরঙ্গও উঠিতেছে, তিনি মনের দুঃখ মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া আপনার জীবনকে ধিক্কার দিতেছেন।

আর বিলম্ব নাই—শেষ ঘণ্টা বাজিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিবার হুস্ হুস্ করিয়া গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল; এই গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের হৃদয় যুগপৎ আনন্দে উথলিয়া উঠিল। হৃদয়ে একটা আনন্দের প্রকাণ্ড তরঙ্গ ভীষণ বেগে উঠিয়া সকলের হৃদয়কে নাচাইতে লাগিল। এই মুহূর্ত্তে প্রবাসীর মনের অবস্থা প্রবাসী ভিন্ন কাহার হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই; গ্রন্থকার মনের সে ভাব বর্ণনায় অক্ষম।

দমদমা, বেলঘরিয়া, সোদপুর প্রভৃতি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ি ভীষণ বেগে ছুটিল; কিন্তু ইন্‌জিনের সেই ভীষণ বেগ এইখানে পরাস্ত হইল, অনেকেরই মন মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহে গিয়া জনক জননী প্রভৃতি গুরুজনের চরণে প্রণাম করিল, সন্তান সন্ততির মুখ চুম্বন করিল, প্রণয়িণীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল। মনের ন্যায় দ্রুতগামী এ জগতে কিছুই নাই; মন ইচ্ছা করিলেই আমাদিগকে পৃথিবীর যে কোন স্থানে হউক না কেন লইয়া যাইতে পারে।

ক্রমে ক্রমে গাড়ি বগুলা এষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এই খানে উপেন্দ্রনাথকে নামিতে হইবে, তিনি পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন—গাড়ি থামিবামাত্র গাড়ি হইতে নামিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন্দ্র ও ভৃত্য নামিল। দ্রব্যাদি সকল বুঝিয়া লইয়া উপেন্দ্রনাথ একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

উপেন্দ্রনাথের যে গ্রামে বাস তাহার নাম উমীপুর, বগুলা ষ্টেশন হইতে সে গ্রাম বার ক্রোশ। পল্লীগ্রামের রাস্তা যেরূপ কদর্য্য, তাহাতে আবার গাড়ী ও ঘোড়ার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, সুতরাং এই বার ক্রোশ রাস্তা যাইতে অধিক বিলম্ব হইবে। আমরা এই সুযোগে উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রের পরিচয় দিতেছি।

উপেন্দ্র রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর। রামগোপাল একজন পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার, জমিদারীর আয় প্রায় বৎসরে ৮।১০ হাজার টাকা। রামগোপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবগোপাল কলিকাতায় সদর দাওয়ানী আদালতে মোক্তারী করিতেন, এই সময় তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া দেশে ভ্রাতার নিকট পাঠাইতেন, রামগোপাল গৃহে বসিয়া সংসারের খরচ পত্র বাদে আপনার নামে এই সকল জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; লোকে অনেক সময় জ্যেষ্ঠের বিপক্ষে অনেক কথা বলিত, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনরূপ সন্দিহান ছিলেন না, সুতরাং জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি অচলা ছিল। কলিকাতায় বিসূচিকা রোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়; তিনি পঞ্চম বৎসরের এক পুত্র রাখিয়া যান, পুত্রের নাম ধীরেন্দ্রনাথ। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরেই ধীরেন্দ্রের বিধবা মাতার ও মৃত্যু হয়। ধীরেন্দ্র অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হয়।

রামগোপাল বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহেন্দ্রনাথ। রামগোপাল বাবু বড় সহজ লোক ছিলেন না; ভ্রাতষ্পুত্রকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিবার মানস তাঁহার প্রথম হইতেই ছিল; এবং ধর্ম্ম পথে থাকিয়াই হউক, আর অধর্ম্ম পথে থাকিয়াই হউক পুত্রদিগের জন্য কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা তাঁহার চিরকাল বলবতী। পাছে ভ্রাতুষ্পুত্র লেখা পড়া শিখিয়া আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে পারে, এই জন্য তিনি ভ্রাতষ্পুত্রকে লেখা পড়া

শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রনাথ ও ভিতরে ভিতরে পিতার এই সকল কার্য্যের পোষকতা করিত, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ পিতার এইরূপ অন্যায় কার্য্য দেখিতে পারিতেন না; পিতাকে বিনীতভাবে অনেক সময় এরূপকার্য্য করা যে অন্যায় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। উপেন্দ্র ধীরেন্দ্রকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, ধীরেন্দ্রও ছোট-দাদা বলিতে অজ্ঞান হইত।

যখন উপেন্দ্রের কলিকাতায় কোন গবর্ণমেণ্ট আফিষে কর্ম্ম হইল, তখন তিনি ধীরেন্দ্রকেও কলিকাতায় আনিয়া লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা রামগোপাল ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহেন্দ্র এই বিষয়ে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও আপত্তি শুনিলেন না। ধীরেন্দ্র কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ সুখ্যাতির সহিত প্রবেশীকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; এই বৎসর তাহার ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষার বৎসর। তিনি সেই জন্য পূজার অবকাশে বাড়ি আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কেবল উপেন্দ্র এবং ভার্য্যা চপলার অনুরোধে বাড়ি আসিতে বাধ্য হইলেন।

পিতৃমাতৃহীন খুল্লতাত পুত্র ধীরেন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও যত্ন করা, দুঃখী প্রতিবেশীকে অর্থ সাহায্য করা, সংসারে সকল বিষয়েই কেবল ধর্ম্মপথে চলা, প্রভৃতি এই সকল কারণে উপেন্দ্র পিতার বড় প্রিয় ছিলেন না। মহেন্দ্র সম্পূর্ণ পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, এই জন্য তিনি পিতার বড় প্রিয় পাত্র ছিলেন; তবে উপেন্দ্র যে প্রতিমাসে আপনার বেতন হইতে ১০০৲ টাকা পিতাকে দিতেন, কেবল এই কারণে তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেন, এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে কোন কথা বলিতেন না। রামগোপাল টাকা বড় ভাল বাসিতেন, যে কোন উপায়ে হউক কিছু টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে তিনি তাহাতে বিমুখ হইতেন না। মহেন্দ্র বাড়িতে থাকিয়া জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন, এবং পিতাকে সকল সময়ে তাঁহার মনোমত পরামর্শ দিয়া তাঁহার প্রিয় হইতেন।

অতি শৈশবাবস্থায় মহেন্দ্রের বিবাহ হয়, তখন ধীরেন্দ্রের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, এবং মহেন্দ্রের শ্বশুর ও একজন ধনী লোক, সুতরাং সে বিবাহ অতি সমারোহের সহিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রের স্ত্রীর নাম শশীকলা। সে

কিছু গর্ব্বিতা, আপনার রূপের ও ধনের গৌরবে উন্মত্তা। উপেন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত হইয়া পরে আপনি মনোনীত করিয়া বিবাহ করেন, তাঁহার শ্বশুর ও একজন সম্ভ্রান্ত লোক, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী প্রিয়ম্বদার কোনরূপ অহঙ্কার ছিল না, সর্ব্বদাই নম্র, বিনীত, পরদুঃখকাতরা। আজ চারি বৎসর হইল ধীরেন্দ্রেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অতি দরিদ্র কন্যা এবং মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের স্ত্রীর ন্যায় রূপবতী ছিল না। এ সকল গুণ না থাকিলেও ধীরেন্দ্রের স্ত্রী চপলা অতি শান্ত, ধীর, ও পরিশ্রমী ছিল। এ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের ও ধীরেন্দ্রের কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই, উপেন্দ্রের একটি তিন বৎসেরর কন্যা, এবং ছয় মাসের পুত্র।

আমরা দুই চারি কথায় এখন এক প্রকার উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রের পরিচয় দিলাম, অন্যান্য বিষয় পরে প্রকাশ হইবে। তিনি ক্রমে ক্রমে যত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। যখন দূর হইতে নিজ গ্রামের বৃক্ষাদি দেখিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না; মনে কত কথা উদয় হইতে লাগিল। তিনি আপনার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"ভাই ধীরেন্ বেলা সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে, বাড়িতে পৌছিতে চারিটা বাজিবে, এখন অবধি তোমার খাওয়া হইল না; তোমার মুখ দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে।"

ধীরেন উত্তর করিল—

"দাদা, আমার কষ্ট কিছুই হয় নাই; আমার অপেক্ষা আপনার কষ্টই অধিক হইয়াছে, আমি ভাল করিয়া জলখাবার খাইয়াছি, কিন্তু আপনি এখন ও কিছুই আহার করেন নাই।"

"দেখ ধীরেন, বাড়ি যাইবার সময় আমার মনে এত আনন্দ হয় যে, ক্ষুধা তৃষ্ণার বিষয় আমার কিছুই মনে থাকে না।"

ধীরেন্দ্র ঈষৎ একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল—"সকলি বৌঠাকুরাণীর অনুগ্রহে।" এইরূপ দুই চারি কথা হইতে হইতে তাঁহারা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এক বাজার আছে, সেইখানে গাড়ি থামাইয়া তাঁহারা পদব্রজে গ্রামের ভিতর চলিলেন। উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রকে

দেখিয়া গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একেবারে আহ্লাদে অধীর হইল। কেহ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার বাড়িতে সংবাদ দিল, কেহ বা কুশল-প্রশ্ন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখের রজনী।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে; প্রিয়ম্বদা স্বামীর জন্য আহারাদি লইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; উপেন্দ্র অপরাহ্নে আহার করিয়াছিলেন, সুতরাং এখন তাঁহার আহারের এমন বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু উপে-নের সে আহার প্রিয়ম্বদার মঞ্জুর নহে, সে আহার প্রিয়ম্বদা স্বহস্তে দেয় নাই, উপেনকে যত্ন করিয়া মাথার দিব্য দিয়া "এটি খাও, ওটি খাও" বলে নাই, সে আহারের সময় শ্বশুর শ্বাশুড়ী নিকটে ছিলেন, সেই জন্য লজ্জায় প্রিয়ম্বদা সে আহার দেখিতে যাইতে পারে নাই; সুতরাং প্রিয়ম্বদার নিকট উপেনের সে আহার মঞ্জুর হয় নাই। উপেন আহারান্তে প্রতিবেশীদিগের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সহিত দেখা করিতেছিলেন, সকলের সংবাদ লইতেছিলেন, আত্মীয় ও বন্ধু সকলের নিকট নানা প্রকার গল্প করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। প্রিয়ম্বদার তাহা অসহ্য হইতে লাগিল। তিনি কন্যা ও পুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া একখানা কি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন, দুই চারি বার পাতা উলটাইয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন; এই সময় কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন; সেই পায়ের শব্দ শুনিয়া কে আসিতেছে অবিদিত রহিল না। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু সতৃষ্ণনয়নে একবার দরজারদিকে চাহিল, অমনি দরজা খুলিয়া সেই সময় উপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

উপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন যে প্রিয়ম্বদা তাহার আহারের উদ্যোগ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"প্রিয়ম্বদা, তুমি এখনও আমার জন্য বসিয়া রহিয়াছ?"

প্রিয়ম্বদা ঈষৎ হাসির উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ঘুম এখনও আসে নাই, তাই বসিয়া রহিয়াছি; তোমার কি আহারের কথা মনে নাই? বাড়ি আসিবামাত্রেই কি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়?"

"আমার ক্ষুধা নাই, যাহা কিছু ছিল এখন আর তাহাও নাই; তোমার ঐ সুন্দর মুখ খানি দেখিলে কি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে?"

"আমি পোড়ার মুখী। এখন তুমি আহার করিতে বস।"

এই বলিয়া প্রিয়ম্বদা উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া আহার করিতে বসাইল, অনিচ্ছা স্বত্বেও পত্নীর অনুরোধে তিনি আহার করিতে বসিলেন। আহার করিতে বসিয়া উপেন্দ্র পত্নীর সহিত নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। গল্প এইরূপ চলিতে লাগিল।—

"সরজিনী—আর খোকা কি ঘুমাইয়াছে?"

উপেন্দ্রের কন্যার নাম সরোজিনী।

"তাহারা এই মাত্র ঘুমাইল; আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, সরোজিনীকে আর খোকাকে তুমি কোলে করিয়া লইবে; আমি সেই জন্য তাহাদের এতক্ষণ ঘুমাইতে দিই নাই।"

"কেন আমি ত আসিয়াই তাহাদের কোলে লইয়াছিলাম।

"আমি তাহা দেখি নাই, আমার চক্ষু ত তাহা দেখিয়া সার্থক হয় নাই।"

"প্রিয়ম্বদা, আমি সরোজিনীর জন্য যে পোষাক আনিয়াছি তাহা কেমন হইয়াছে?"

"আমি ত পূজার সময় সরোকে সে পোষাক পরিতে দিব না।"

"কেন?"

"দেখ, পাড়ার কত দুঃখী লোকের ছেলে মেয়ে রহিয়াছে, তাহারা এই পূজার সময় একখানা নূতন কাপড়ও পায় না; ঘোষেদের অমন সুন্দর ছেলেটি আজ একখানা নূতন কাপড়ের জন্য ধুলায় পড়িয়া আছাড় কাছাড় খাইতেছিল, তাহা দেখে আমার চক্ষে জল আসিল; আমি তাহার মাকে একটা টাকা দিতে যাইতেছিলাম, ঠাকরুণ দিতে দিলেন না; সে জন্য আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। ঘোষেরা আর আমাদের পুকুরের ধারে

বাগ্‌দীরা বড় দুঃখী, তুমি তাহাদের ছেলেদের কাপড় না আনিয়া, সরোর জন্য অমন দামী পোষাক আনিলে কেন ?”

“তাহার জন্য ভাবনা কি ? আমি কালই তাহাদের ছেলের কাপড় কিনিয়া দিব। দেখ প্রিয়ম্বদা,তুমি যে দুঃখী লোকের প্রতি দয়া কর তাহাতে আমি বড় সুখী হই ; তুমি যদি সরোজিনীর অমন সুন্দর পোষাকটি কোন দুঃখী লোকের মেয়েকে দান করিতে তাহা হইলেও আমি তোমার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইতাম।’

“দেখ, গরিব লোকের দুঃখ দেখিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, কিন্তু ঠাকুরুণের ভয়ে আমি কাহাকে কিছু দিতে পারি না। আমি সকালে উঠিয়াই ঘোষেদের আর বাগ্‌দীদের বাড়ি যাইব ; আর তুমি যে তাহাদের ছেলে ও মেয়েদের কাপড় কিনিয়া দিবে, তাহা বলিয়া আসিব। শুনিলে তাহাদের কত আহ্লাদ হ’বে। আর উত্তর পাড়ায় যে একজন গরিব ব্রাহ্মণ আছে, তাহাকে তোমায় কিছু টাকা দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ আজ তোমার আসিবার কথা ছিল বলিয়া তিন চারি বার আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিল ; তাহার নাকি বড় কষ্ট, তুমি কিছু টাকা তাহাকে দিলে তিনি তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করিবেন।”

“আচ্ছা তাহাই হইবে” বলিয়া উপেন্দ্র আহার শেষ করিল।

প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে হাত মুখ ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিল। এই সকল কার্য্যের পর উভয়ে পালঙ্কের উপর বসিল। উপেন পত্নীর হাত ধরিয়া বলিল—

“প্রিয়ম্বদা, তোমার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ, তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্নলাভ করা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।”

প্রিয়ম্বদা লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল।—

“তোমারই সুখ্যাতি শুনিলে আমার বড় আহ্লাদ হয়, আমি যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাই। তুমি কখন মন্দ হইও না, যেন পৃথিবী শুদ্ধলোক তোমার সুখ্যাতি করে, আর আমি যেন তোমার সুখ্যাতি শুনিতে শুনিতে তোমার কোলে সরো আর খোকাকে দেখিতে দেখিতে মরিতে পারি।”

কথা শুনিয়া উপেন শিহরিয়া উঠিল ;“রাক্ষসী” বলিয়া প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন দিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। এইরূপে সেই দিনের সুখের রজনী শেষ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শয়ন গৃহে।

ধীরেন্দ্র তাঁহার শয়ন গৃহে বসিয়া আছেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সম্মুখে এক খানা কি পুস্তক খোলা রহিয়াছে এবং চারি ধারে আরো অনেক পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে। পরীক্ষা নিকট হইলেও এখন তাঁহার পাঠে বড় মনোযোগ নাই; কারণ মন স্থির নয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঠে মন স্থির হইতেছে না, সে কাহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। ধীরেন্দ্র এক এক খানি করিয়া অনেক পুস্তক খুলিলেন, কিন্তু কোন পুস্তকই তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি এক বার দরজার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে কাহার প্রত্যাশায় চাহিতে লাগিলেন, আবার বিরক্ত হইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে বাহিরে কোনরূপ শব্দ শুনিবার জন্যও কান পাতিয়া থাকিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি ১১টা অবধি কাটিল, তাহার পর দরজায় কিসের শব্দ হইল, কে যেন ধীরে ধীরে অতি সাবধানে দরজা খুলিয়া গৃহে আসিল, এইরূপ বোধ হইল। সে শব্দ শুনিয়া ধীরেন্দ্রের হৃদয় যুগপৎ কাঁপিয়া উঠিল, তিনি তখন সে ভাব গোপন করিয়া আগন্তুককে তাঁহার পাঠে মনোনিবেশ বশতঃ বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা দেখাইবার জন্য একবারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিলেন। একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা গৃহে প্রবেশ করিল। বালিকা ধীরেন্দ্রের স্ত্রী চপলা।

চপলা গৃহে প্রবেশ করিয়া এই অবসরে একবার সতৃষ্ণ নয়নে স্বামীর মুখ খানি দেখিয়া লইল, তাহার পর তাঁহার ইতস্ততঃ ছড়ান পুস্তকগুলি গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিল। পরে ধীরেন্দ্রের হস্তস্থিত পুস্তকের প্রতিও টান পড়িল, ধীরেন্দ্র তখন বাধ্য হইয়া ঘাড় তুলিলেন এবং চপলার প্রতিও কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"বিরক্ত কর কেন? আমায় পড়িতে দাও।"

চপলা উত্তর করিল—"এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর আজ ছুটি

বাড়ি আসিয়াছ, আজ কি বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়া ভাল দেখায়? তোমার কথা কতদিন শুনি নাই, তোমার সহিত গল্প করিতে আমি বড় ভাল বাসি।"

"সেই জন্য সকল কাজ ছাড়িয়া এত সকাল সকাল আমার কাছে আসিয়াছ।"

"বুঝিয়াছি। তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ। আমি কি করিব, সকলে না শুইলে কি তোমার কাছে আসিতে পারি; আমার লজ্জা করে যে।"

"কেন, বড় বৌ কি মেজ বৌয়েরাত এবিষয়ে কোন লজ্জা করেনা, আর তুমি কি তাহাদের অপেক্ষা এতই লজ্জাবতী?"

"বড় দিদি, মেজ দিদি যে বড় হইয়াছে আর আমি যে তাহাদের চেয়ে অনেক ছোট।"

"ছোট হইলেই কি স্বামীর কাছে রাত্রি ১১ টার পূর্ব্বে আসিতে লজ্জা বোধ হয়।"

"লজ্জা না করিলে লোকে যে নিন্দা করিবে, এততেও জেঠাইমা আর বড় দিদি কত কথা বলেন।"

"আমি জানি ভালবাসা অধিক থাকিলে এরূপ লজ্জা এত অধিক থাকে না; তোমাতে সেরূপ ভালবাসার অভাব আছে।"

"তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমার উপর রাগ করিও না। তোমার ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া তবে আমি শুইতে পাই।"

"সংসারে তুমি যে দাসীর ন্যায় আছ, এবং তোমাকেই যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা তোমার দেহ দেখিয়াই আমি জানিতেছি এবং সেই জন্যই যে তুমি এত রাত্রে শুইতে আসিয়াছ, তাহাও আমি জানি। আচ্ছা, চপলা, সংসারে ত অনেকেই আছেন তবে তোমাকেই এত পরিশ্রম করিতে হয় কেন?

"আমি না করিলে আর কে করিবে? বড় দিদির শরীর ভাল নয়, তিনি কোন কাজ করেন না, মেজ দিদি ছেলে মেয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তবু আমার কষ্ট দেখিয়া অনেক সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, যাহা পারেন করেন, আর জেঠাই মা বুড়া মানুষ, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও, তবে আমি করিব না তো কে করিবে?"

"চপলা, স্ত্রীলোক পরিশ্রমী হওয়াই উচিত, তুমি যে পরিশ্রমী তাহাতে আমি সন্তুষ্ট আছি, তোমার এই সকল গুণেই আমি মোহিত হইয়াছি। অন্যে তোমায় সুন্দরী বলিয়া স্বীকার না করিলেও আমার চক্ষে আমি তোমায় বড় সুন্দরী দেখি। তবে আমার কষ্টের কারণ এই যে এখনও তুমি বালিকা, এ অবস্থায় তোমার সেরূপ যত্ন বা আদর করিবার কেহ নাই। আজ যদি আমার মা থাকিতেন——"

চপলা ধীরেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন———

"আমি আর কাহারও যত্ন চাই না ; তোমার আদর ও যত্ন পাইলেই আমি স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাই।"

"তোমার এত গুণই বটে।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্র পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন। চপলা একেবারে আহ্লাদে অধীরা হইল। তাহার পর ধীরেন্দ্রকে ধীরে ধীরে বলিল——

"তুমি না কি পূজার সময় আসিবে না বলিয়াছিলে ?"

"পরীক্ষা নিকট বলিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলাম, কিন্তু—তুমি টানিলে কি না আসিয়া থাকিতে পারি ?"

বালিকা আর কিছু বলিল না, একবার অতৃপ্ত লোচনে ধীরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একবিন্দু অশ্রু মুছিয়া ধীরেন্দ্র বালিকাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্য এক শয়ন গৃহে।

সেই রাত্রে অন্য এক শয়ন গৃহে দুই দম্পতীর অন্য এক প্রকার অভিনয় হইতেছিল। আমরা তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আজ শশিকলার শরীর বড় অসুস্থ, এইরূপ অসুস্থ মধ্যে মধ্যে প্রায়ই হইয়া থাকে। মহেন্দ্র অনেক চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই রোগের উপশম করিতে পারে নাই। আমরা জানি শশিকলার

শরীরে কোন রোগই নাই, এ রোগ তাহার মনে। শশিকলা কাহার ভাল দেখিতে পারিত না ; কাহার হাসিমুখ দেখিলে শশিকলার প্রাণে বড় আঘাত লাগিত ; তিনি আপনার হিংসানলে আপনি পুড়িতেন। ইহা ব্যতীত শশিকলা অনেক সময় অনেক প্রকার অত্যাচার করিত ; শশিকলার কোপানলে পড়িতে হইবে বলিয়া কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহসী হইত না। মহেন্দ্র স্ত্রীকে বড় ভয় করিত, তাহার স্বভাব মন্দ জানিয়াও ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিত না। কোন সময়ে কোন কথা বলিলে শশিকলা রাগে ও অভিমানে একেবারে অধীরা হইত এবং তাহার অত্যাচারেরও বৃদ্ধি হইত। আজ শশিকলার শরীর অসুস্থ, কারণ আজ সে প্রিয়ম্বদার ও চপলার হাসি মুখ দেখিয়াছে। রোগ বৃদ্ধি হইবার ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। মহেন্দ্র রাত্রি নয়টার সময় শয়ন গৃহে গিয়া দেখিলেন যে আজ রোগের সহিত আরো কিছু মিশ্রিত আছে—সেই টুকু অভিমান। তাহার লক্ষণ এই যে এখন কিছুই শীত না থাকিলেও শশিকলা পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত লেপ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। শশিকলার অভিমান হইলেই সে আগাগোড়া লেপ ডাকিয়া শয়ন করিত। মহেন্দ্র মানের লক্ষণ দেখিলেন বটে, কিন্তু কারণ কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেম না। কিছুক্ষণ ইতস্তত: করিয়া তিনি মান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু নানা প্রকার সাধ্যসাধনাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে মহেন্দ্রও বড় বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, সেই সময় শশিকলা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উন্নতস্কন্ধে বলিল———

"তুমি যাবে, চলিয়া যাও ; আমায় একগাছা দড়ি দিয়া যাও আমি আজ গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"

মহেন্দ্র তখন কিছু আশ্বস্থ হইয়া বলিলেন———

"কি হইয়াছে আগে বল না।"

"আমার কি হইয়াছে সে কথা তোমার শুনিয়া আবশ্যক কি? আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াত তোমার ঘুম হয় না।"

"কেন,তুমি যখন যাহা বল,আমি তখনই তাহাই করি ; তোমার জন্য আমায় কত অন্যায় কর্ম্ম করিতে হইয়াছে। এত করিয়াও তোমার মন পাইলাম না?"

"আমার কথা যদি শুনিতে, তাহা হইলে আর তোমার অমন দশা হইত না। আর তোমার হাতে পড়িয়াইত আমার এত কষ্ট। যখন জন্মিয়াছিলাম, মা যদি আমায় নুন্ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে আর আমায় এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।"

এই বলিয়া শশিকলা অনেক কষ্টে ২।৪ ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল। শশিকলার চক্ষে জল দেখিয়া মহেন্দ্রের বড় কষ্ট হইল, বিনীতভাবে বলিলেন—

"শশি, তুমি কাঁদিও না; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি এখন হইতে তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব; কখন তোমার কথার অবাধ্য হইব না। এখন আমায় কি করিতে হইবে বল।"

"কেন তোমার কি চক্ষু নাই? চক্ষের সম্মুখে রাত্রি দিন দেখিতেছ সংসারের মধ্যে তোমার খরচ কি আর তোমার ভেয়ের খরচ কি। তাহার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ের খরচ যে কত টাকা হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই দেখ, ছেলে ও মেয়ের দুধের খরচ, তাহাদের পোষাকের খরচ, তাহার পর মেয়ের বিবাহ আছে, ছেলের পৈতে আছে,—আর আমি কত বলিব। ইহা নিশ্চয় জানিও, যে সকল টাকা খরচ হইবে, তাহার আট আনা তোমার, আর আট আনা তোমার ভেয়ের। আর যদি বল, সে চাকরি করে; তেমন তুমিও বিষয় রক্ষা করিতেছ; ইহাওত একটা কাজ। এইরূপে যে তোমার টাকা লণ্ডভণ্ড হইতে চলিল, তাহার কি উপায় করিয়াছ বল।"

"ইহার আবার উপায় করিব কি? আমারও যদি সন্তান সন্ততি হইত আমারও তাহা হইলে এই সকল খরচ হইত। আর ইহারা কেহ অপর নহে ভাইপো কি ভাইঝিতে আর ছেলে মেয়েতে প্রভেদ কি? তোমার এই সকল বিষয়ে হিংসা করা অন্যায়।"

"কি! আমি তোমার ভালর জন্য মরি, আর তুমি আমায় যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবে! এই তুমি আমার সকল কথা শুন। আমি আর এ সংসারে থাকিব না; ঘরে আগুন লাগাইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইব।"

এই বলিয়া শশিকলা বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। মহেন্দ্র তাহাকে ধরিতে গিয়া একরকম প্রহার খাইল।

কিন্তু তথাচ ছাড়িল না। শশিকলা সে স্থান হইতে যাইতে না পারিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কিছু রাগ থামিলে মহেন্দ্র কথা কহিতে সাহস পাইল। কাতর ভাবে বলিল———

"আমার অপরাধ হইয়াছে, আর আমি তোমায় কোন কথা বলিব না। কিন্তু তুমি যে সকল বিষয় বলিলে তাহার কি উপায় করিতে হইবে, তাহাতো আমি কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

শশিকলা তখন ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল———

"আমি কি তাহার উপায় না করিয়া তোমায় এত কথা বলিলাম? তুমি কেন আমার গহনা গড়াইয়া দাও না। আমার নামে কোম্পানির কাগজ কিনে রাখ না।"

"বাবা শুনিলে কি বলিবেন?"

"কেন তুমি যে আমার গহনা দিতেছ তাহা বলিব কেন? বলিব যে আমার মা গহনা গড়াইয়া দিয়েছে। আর আমার মা বাপত আর ছোট বউয়ের মা বাপের মত গরিব নয়, যে সে কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। আর আমার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিলে তাহা কে জানিতে পারিবে?"

অগত্যা মহেন্দ্র তাহাই স্বীকার করিলেন। এইরূপে সেদিনকার রজনী মহেন্দ্র নিস্তার পাইলেন। অবশিষ্ট যে রাত্রি টুকু ছিল; তাঁহার আর নিদ্রা হইল না, কেবল বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

অতি প্রত্যূষেই মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন; সমস্ত রাত্রে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ ছিল, কিন্তু বাড়িতে পূজা, আজ ষষ্ঠী, সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না; আর বিশেষত মহেন্দ্র বাড়িতে থাকিতেন, সুতরাং এ সকল বিষয় তাঁহারই উপর নির্ভর ছিল। উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র প্রাতে

উঠিয়া আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। শশিকলা বেলা নয়টা পর্য্যন্ত নিদ্রা দিল, তাহার পর একজন বিশ্বাসী চাকরাণীর দ্বারা বাহিরে মহেন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইল, যে কাল রাত্রে যে কথা হইয়া গিয়াছে, এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করা হউক। শশিকলার এক ছড়া সোণার চন্দ্রহার আবশ্যক ছিল, সে চন্দ্রহার অন্ততঃ বিজয়ার দিন পরিয়া যাহাতে প্রতিমা বরণ করিতে পারেন, সে জন্য মহেন্দ্রের উপর হুকুম জারি হইল। তিনি হুকুম পাইয়া তাহা অমান্য করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং তাহাকে এই কাজের ঝঞ্ঝাটের সময় চন্দ্রহারের চেষ্টায় ছুটিতে হইল।

প্রিয়ম্বদা প্রাতে উঠিয়া ঘোষেদের ও বাগ্দিদের বাড়ি গেল এবং তাহাদের এই পূজার সময় যে নূতন কাপড় হইবে, সেই সংবাদ দিয়া আসিল। বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেই পাড়ার যে সকল অনাথ স্ত্রীলোক ছিল, সেই দিক্ দিয়া আসিল; এবং তাহাদিগকে একবার উপেন্দ্রের সহিত দেখা করিতে বলিল, কোন্ সময় তাহার সহিত দেখা করিবার সুবিধা হইবে তাহাও বলিয়া দিল। প্রিয়ম্বদা জানিত যে উপেন্দ্রের সহিত দেখা হইলে অবশ্যই তাহারা কিছু পাইবে, তাহাতে তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে।

চপলাও প্রাতে উঠিয়া সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। চপলা বালিকা হইলেও সাংসারিক সকল কার্য্য জানিত, এবং গৃহিণীর মন রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া অতি শৈশবাবস্থাতেই চপলা গৃহকর্ম্ম শিখিয়াছিল। চপলা লেখা পড়া কিছুই জানিত না; এবং শিখিবারও যত্ন ছিল না। ধীরেন্দ্র মধ্যে মধ্যে চপলাকে লেখা পড়া শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু শেষে বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। চপলা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা না হইলেও চপলার অনেক গুণ ছিল, এত অল্পবয়সে সে সকল গুণ অসাধারণ। চপলা প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভাল বাসিতে জানিত, সে ক্ষুদ্র হৃদয়ের যত দূর সাধ্য যথাযোগ্য স্থানে ভক্তি, স্নেহ করিত। দুঃখের অবস্থায় কষ্ট বোধ নাই, সুখের অবস্থায় আনন্দের উচ্ছ্বাস নাই, চপলার জীবনস্রোত যেন একটী স্রোতঃস্বতী; জোয়ার কিম্বা ভাঁটা নাই, প্রবল ঝড়ে উত্তাল তরঙ্গ উঠিবার সম্ভাবনাও নাই। চপলার জীবনপুস্তকে সন্তোষই একটি প্রধান অধ্যায়। চপলা এই বয়সেই সকল প্রকার রন্ধন কার্য্যে সুনিপুণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমরা সকলের এক প্রকার পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু এবাড়ির কর্ত্তা ও গৃহিণীর পরিচয় এখন ও দিই নাই। কর্ত্তার দেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি আছে, প্রায়ই গঙ্গাস্নান করা হয়; সন্ধ্যা আহ্নিক নিত্যকর্ম্মের কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মধ্যে মধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন ও হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি একজন অর্থপিশাচ, অর্থের জন্য সকল প্রকার দুষ্কৃতি করিতে প্রস্তুত। তাঁহার আর একটি অপবাদ আছে, বাড়িতে এক জন অল্প বয়স্কা বিধবা গয়লানী দুধ দিয়া যাইত, কর্ত্তাটি তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে উভয়ে এক ভাবের মৃদু হাসি হাসিত; আর গোপনে কি পরামর্শও হইত। এই বুড়া বয়সে তাঁহার একজন অল্পবয়স্কা বিধবার সহিত এরূপ হাসি অনেকের চক্ষে ভাল লাগিত না, সেই জন্য তাঁহার একটা ক্রমে অপবাদ উঠিয়াছিল; কিন্তু সে সকল কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিত না। এই বিধবা গয়লানী তাঁহার সম্পর্ক-বিরুদ্ধ ছিল না; কর্ত্তা তাহাকে আদর করিয়া নাতনি বলিয়া ডাকিতেন।

গৃহিণী দোষে গুণে মিশ্রিত। অর্থসম্বন্ধে যদিও সেরূপ মুক্তহস্তা ছিলেন না, কিন্তু লোককে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীর অনুগমন করিতেন। কিন্তু তিনি বড় কলহপ্রিয় ছিলেন, সামান্য কারণে কলহ করিতে ভাল বাসিতেন, এবং রাগে অধীর হইয়া মুখে যাহা আসিত, তখন তাহাই বলিতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহার স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ ছিল না। কর্ত্রীর আর এক দোষ ছিল—বড় পক্ষপাতী; তিনি আপনার দুই পুত্র ও পুত্রবধুকে সমান স্নেহ করিতেন না; পুত্রদিগের মধ্যে তাঁহার ইতরবিশেষ ছিল; জেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী শশীকলাকে যেরূপ ভাল বাসিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্র এবং তাঁহার স্ত্রী প্রিয়ম্বদাকে সেরূপ ভাল বাসিতেন না।

আমরা আর কিছু না পাইয়া এইরূপ নানা কথায় এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ লিখিলাম।

—*·*—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উৎসবে।

আজ সপ্তমী-পূজা। রামগোপাল বাবুর বাড়ি আজ আনন্দ ও উৎসবে পরিপূর্ণ। অতি প্রত্যুষেই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা আজ এই খানে উপস্থিত, সকলেই এক একটি কার্য্যে ব্যস্ত। পূজা বাড়িতে যেরূপ কোলাহল হওয়ার সম্ভব, এখানে তাহার কোন ত্রুটিই হইতেছিল না। বালকবালিকাগণের কলহ ও রোদন, পাড়ার অকর্ম্মণ্য কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকের গলাবাজি, যুবকদিগের উচ্চহাসি, রমণীগণের কোমল কণ্ঠবিনিঃসৃত কর্কশ বাক্‌বিতণ্ডা এই সকল একেবারে সপ্তমে উঠিতেছিল, মধ্যে মধ্যে ঢোলের বাদ্য ইহাদের সাহায্য করিতেছিল। ইহা ব্যতিত আরো অনেক প্রকার কোলাহল উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ এ স্থলে আবশ্যক বোধ হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে পূজা আরম্ভ হইল, ধূপ ধুনার গন্ধে চারি দিক আমোদিত হইল, তখন কর্ত্তৃপক্ষীয় পুরুষ ও অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের ভক্তির উদয় হইল, সকলে করযোড়ে প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গণেশজননীর চাঁদমুখ দেখিয়া অনেকে ভক্তিরসে গলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল, নিমন্ত্রিত লোকে বাড়ি পরিপূর্ণ হইল। এখন এই পরিবারের মধ্যে কে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইল দেখা যাউক।

কিরূপে নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট পূজা শেষ হয়, তাহার জন্য কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত। মধ্যে মধ্যে করযোড়ে গললগ্ন কৃতবাস হইয়া "মা জগদম্বে" রবে গগন ফাটাইতেছেন। পূজার পর তাঁহার লক্ষ্য কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রতি। কিসে এখন ব্রাহ্মণ-ভোজন সুচারুরূপে শেষ হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মন উদ্বিগ্ন। পূজা আর ব্রাহ্মণভোজন ব্যতিত অন্য কোন বিষয়ে কর্ত্তার বড় মনোযোগ নাই।

জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রনাথ পিতার সন্তোষের জন্য তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু তাহার সে কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ ছিল না, কারণ রাত্রে যে এক সকের অপেরা হইবে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে তিনি বিশেষ

উদ্বিগ্ন। অপেরার অবতারদিগকে সন্তুষ্ট করা সাধারণ ব্যাপার নহে; কিসে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ভাবিত। তবে পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রতি অমনোযোগ করিলে পাছে কর্ত্তা অসন্তোষ হন, সেই জন্য এক একবার আসিয়া পিতার সম্মুখে ঐ সকল কার্য্য ও দর্শন করিতেছেন।

কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত ও সমাগত সকল লোকের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। যে যেরূপ ব্যক্তি তাহার সেইরূপ সম্মান করিতেছেন। দরিদ্র লোকেও যাহাতে কোনরূপে অসন্তোষ না হয়, তাহার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। উপেন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের দরিদ্র লোকদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত আহার করান। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা এই যাহাতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক না হইয়া কাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হয়, এবং যাহাতে কাঙ্গালীর ভোজন ভালরূপ হয়, সেই জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত।

ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ প্রাণপণে উপেন্দ্রের সাহায্য করিতেছেন। বাস্তবিক সকল কার্য্যেই ধীরেন্দ্র উপেন্দ্রের ডান হাত স্বরূপ। উপেন্দ্র ইহা ব্যতিত আর একটি কার্য্যে ধীরেন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সে কার্য্য—যাহাতে কোন দ্রব্য নষ্ট বা অপব্যয় না হয় তাহার তদারক করা। ধীরেন্দ্রেরও একান্ত ইচ্ছা এই যাহাতে দুঃখী গরিব লোকের প্রতি কোন রূপ অসদ্ব্যবহার না হয়। অনেক পূজা বাড়িতে কেবল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের প্রতি যত্ন করা হয়, কিন্তু দুঃখী গরিব লোকের প্রতি কেহই কোন রূপ যত্ন করেন না, বরং সময়ে সময়ে তাহাদের প্রতি বিশেষ অসদ্ব্যবহার করা হয়। উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না; যাহাতে সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলের প্রতি সমান যত্ন করা হয় তাহার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

গৃহিনী ঠাকুরাণী কেবল ভাণ্ডার লইয়াই ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে মনোযোগ করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। কিসে সমস্ত দ্রব্য প্রচুর হয় কিসে কেহ কোন দ্রব্য চুরি করিয়া না লইয়া যায় গৃহিনী এই সকল বিষয় লইয়াই একেবারে ব্যতিব্যস্ত। ইহা ব্যতিত মধ্যে মধ্যে চাকর চাকরাণীদিগকেও তাঁহাকে শাসন করিতে হইতেছে।

বড় বধূ আপনার শরীর অসুস্থ বলিয়া কোন কার্য্য করিতেছিল না,

মধ্যে একবার পান সাজিতে বসিয়াছিল, কিন্তু সে গুরুতর পরিশ্রম কোন ক্রমেই তাঁহার সহ্য হইল না, সুতরাং তিনি আপনার আবশ্যকমত পানগুলি সাজিয়া লইয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। শয়ন গৃহে অনেকক্ষণ বসিয়া বিরক্ত বোধ হওয়ায় তাহার একবার তাস খেলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গী মিলিল না বলিয়া তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। অমলা, বিমলা, সরলা প্রভৃতি প্রতিবাসিনীদিগের মধ্যে তাহার যে সকল সঙ্গী ছিল, তাহারা সকলেই যদিও এই বাড়িতেই ছিল, কিন্তু আজ তাহাদের অবকাশ ছিল না, সকলেই কাজে ব্যস্ত। সুতরাং শশীকলার আজ সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

প্রিয়ম্বদার আজ আর আনন্দের সীমা নাই; আজ প্রিয়ম্বদা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, অন্দরমহলে স্বহস্তে দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগের যত্নের সহিত অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছে। প্রাণসম পুত্র কন্যার কথা পর্য্যন্ত আজ তাহার মনে স্থান পায় নাই, গুরুতর পরিশ্রমেও আজ আর তাহার ক্লেশবোধ হইতেছে না। আজ আর প্রিয়ম্বদার ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্ত নাই। প্রিয়ম্বদার আজ এত আনন্দ কেন? প্রিয়ম্বদার আনন্দের কারণ, আজ সে মনের সাধ মিটাইয়া দুঃখীলোককে পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেছে।

আর চপলা?—সুখে যাহার সুখ বোধ নাই দুঃখে যাহার ক্লেশ বোধ নাই সেই সুখদুঃখে স্থিরহৃদয়া অথচ গৃহ কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্তা চপলা আজ কি করিতেছে? চপলা আজ যথার্থই চপলা, এক মুহূর্ত্তের জন্য এক স্থানে স্থির নহে, কখন রন্ধন কার্য্যের সহায়তা করিতেছে কখন বা রন্ধনের আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল আনিয়া দিতেছে, কখন বা প্রিয়ম্বদাকে সাহায্য করিতেছে; আবার কখন গৃহিণীর নিকট বিনা বা সামান্য দোষে তিরস্কার খাইতেছে। কিন্তু কিছুতেই তাহার মনে কোন রূপ কষ্ট হইতেছে না।

এই রূপে পূজার তিন দিবস কাটিল। তাহার পর বিজয়া। বিজয়া বঙ্গালির ক্রন্দনের দিন। তিন দিন ধরিয়া পূজা করিয়া এই দিনে দেবী প্রতিমা তাহাদের বিসর্জ্জন দিতে হয়। দুর্ব্বল সন্তানদিগকে কাঁদাইয়া জগন্মাতা এই দিনে শিবালয়ে চলিয়া যান। কিন্তু এই দিবস এই পরিবারের মধ্যে ইহা অপেক্ষা এক গুরুতর শোচনীয় ঘটনা আছে, সে কথা পরে বলিতেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জনে।

নবমীর শেষ রাত্রে উপেন্দ্রনাথের ২।৩ বার ভেদ ও বমি হইল, প্রিয়ম্বদা ভীত হইয়া ঠাকুরুণকে সংবাদ দিল। উপেন্দ্রের মাতা দৌড়িয়া পুত্রের গৃহে আসিলেন, উপেন্দ্রের শরীর তখন বড় অসুস্থ, শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতেছেন। জননীকে দেখিয়া উপেন্দ্র বলিলেন—"মা, বাবাকে ডাক, আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে।"

কর্ত্তাকে ডাকিতে যাইতে হইল না, গৃহিনী চলিয়া আসিবার সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, প্রিয়ম্বদার ডাকিবার কারণ জানিতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় উপেন্দ্র পুনরায় বমি করিল; কর্ত্তাকে আর কোন কথা বলিতে হইল না; তিনি তখনি ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠাইয়া দিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া বসিলেন। উপেন্দ্র তখন অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল—"বাবা, আমার বুঝি দিন ফুরাইল।"

"ভয় কি বাবা, ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেই তোমার অসুখ আরাম হইবে।"

কর্ত্তা যদিও অনেক কষ্টে কথা কহিলেন বটে, কিন্তু উপেন্দ্রের জননীর হৃদয়ে উপেনের কথা বড় আঘাত করিল, আর যে রমণী অবনতমস্তকে বসিয়া তখন পদসেবা করিতেছিল, তাহার প্রাণ একেবারে উড়িয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে উপেন্দ্রের পীড়ার সংবাদ পরিবারস্থ সকলে জানিল, সকলে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহার নিকট আসিল, কেবল শশিকলার শরীর অসুস্থ প্রযুক্ত আসিতে পারিল না। ধীরেন্দ্র আসিয়া উপেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া আর তথায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আসিল। ডাক্তার পীড়ার অবস্থার কথা শুনিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন, আসিয়াই সেই ঔষধ খাওয়াইয়াদিলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বিষন্ন মনে গৃহ হইতে

বাহিরে আসিলেন। মহেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, পীড়ার অবস্থা কিরূপ দেখিলেন?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন—"রোগ সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু এখনও আশা আছে।" ডাক্তার আর কোন কথা বলিলেন না, শীঘ্র গিয়া আরো ২।৩ রকম ঔষধ আনিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইল, সূর্য্যদেব উদয় হইবার পূর্ব্বেই উপেন্দ্রের পীড়ার সংবাদ গ্রামস্থ সকলে জানিল; সকলেই সে সংবাদে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল, বাড়ি গ্রামস্থ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সে দিন গ্রামে কাহারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়িল না।

ক্রমে বেলা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রোগেরও ততই বৃদ্ধি দেখা গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল, সকলেরই মুখ বিষণ্ণ হইল, কাহার মুখে আর কথা বাহির হয় না। গ্রামে আজ আর লোক নাই; সমস্ত গ্রাম একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ। সকলেই নীরবে জগদীশ্বরের নিকট উপেন্দ্রের আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় উপেন্দ্রের পীড়ার যন্ত্রণা বড় বৃদ্ধি হইল, তিনি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"একবার সকলকে ডাক, আমি জন্মের মত বিদায় লইব।"

নিকটে তখন মহেন্দ্র আর গ্রামস্থ কয়েক জন ভদ্র লোক ছিলেন। গৃহিণী তখন ঠাকুর দালানে দশভূজার নিকট মাথা খুঁড়িতেছিলেন, প্রিয়ম্বদা অনিচ্ছাস্বত্তেও গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিয়া মাটিতে পড়িয়া আছাড় পাছাড় খাইতেছিল, আর মনে মনে জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতেছিল—"প্রভু, সহায় হও, এ বিপদে যেন কুল পাই, এই বয়সেই যেন আমার সকল সাধ আহ্লাদ না ফুরায়।" চপলা নিকটে বসিয়া অশ্রু-জলে প্রিয়ম্বদার অঙ্গ সিক্ত করিতেছিল। ধীরেন্দ্র তখন ডাক্তারের নিকট ঔষধ আনিতে গিয়াছিল। কর্ত্তাঠাকুর ঘরে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেছিলেন। মহেন্দ্র ও অন্যান্য সকলে উপেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিল যে দুই চক্ষু তাহার অশ্রু জলে পরিপূর্ণ।

পরে একে একে কর্ত্তা ধীরেন্দ্র ও অন্যান্য আত্মীয় সকলে আসিল, সকলেরই অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিতেছিল, সকলেই আজ দারুণ মনোকষ্টে অস্থির। উপেন্দ্র সকলকে স্থির হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন——

"আমার জীবন ত ফুরাইল.তবু যতক্ষণ থাকি আপনাদিগের চরণ দেখিতে ইচ্ছা করি, তাই এখন ডাকিলাম। আমার সমস্ত অপরাধ, ক্ষমা করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আর আমার সদ্গতির জন্য ঈশ্বরের নিকট সকলে প্রার্থনা করুন।

সে নিদারুণ কথা শুনিয়া কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না, সকলেই নীরবে রোদন করিল। ধীরেন্দ্রের কি বলিবার ইচ্ছা ছিল, একবার সে কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল না। ধীরেন্দ্র চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল।

ধীরে ধীরে উপেন্দ্র মহেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল, মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বসিল, তখন উপেন্দ্র ডান হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না, তখন চক্ষের জলে উপেন্দ্রের বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য সকলের হৃদয় শোকে অভিভূত করিল, কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। রামগোপাল জ্ঞান শূন্য হইয়া একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।—উপেন্দ্র সকলকে স্থির হইতে ইঙ্গিৎ করিয়া অতি কষ্টে মহেন্দ্রকে বলিতে লাগিল—"দাদা, ইহারই মধ্যে আমায় তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে হইল, আমার এ জন্ম বৃথা হইল; বড় সাধ ছিল, বৃদ্ধ পিতা মাতার এবং অন্যান্য গুরু-জনের সেবা করিব, আত্মীয় স্বজনের উপকার করিব; পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিব; কিন্তু ভাই, আমার মনের কোন সাধই মিটিল না, অসময়ে আমায় যাইতে হইল। আমার জীবনের এই সকল গুরুতর ব্রত আজ তোমার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিলাম। আর আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আর ধীরেন রহিল ইহাদিগকে দেখিও।"

এই সকল কথা মহেন্দ্রের হৃদয়ে বড় আঘাত করিল, আজ তাহার ভ্রাতৃ-স্নেহ উথলিয়া উঠিল। তখন উপেন্দ্র পুনরায় ইঙ্গিৎ করিয়া ধীরেন্দ্রকে ডাকিল। ধীরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বসিল। উপেন্দ্র বলিল—"ভাই ধীরেন, তুমি কাঁদিও না, বাবা রহিলেন, দাদা রহিলেন, তোমার কোন কষ্ট হইবে না।" তাহার পর অতি অস্ফুট স্বরে বলিল—"এই সময় আমায় একবার শেষ দেখা দেখাইবে না?"

ধীরেন্দ্র সে শেষ দেখার অর্থ বুঝিল। সকলকে কিছু অন্তরে যাইতে বলিয়া রোরুদ্যমানা শোকাতুরা প্রিয়ম্বদাকে শেষ দেখা দেখাইতে সেই ঘরে আনিল। তাঁহাকে সে ঘরে রাখিয়া ধীরেন্দ্র অন্য ঘরে যাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রিয়ম্বদাও স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া অস্থির হইয়া আরো কাঁদিতে লাগিল, উপেন্দ্র স্থির নয়নে সেই অশ্রুপূর্ণ মুখখানি দেখিল, অমনি কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া তাহার দৃষ্টিপথ রোধ করিল। অনেক কষ্টে উপেন্দ্র বলিল—

"প্রিয়ম্বদা, এখন কাঁদিবার সময় নয়, কাঁদিবার সময় আর অনেক পাইবে কিন্তু এরূপ সময় আর তোমার জীবনে মিলিবে না। এখন চলিলাম, কাঁদিবার জন্যই তোমার জন্ম যত কাল বাঁচিবে তুমি কাঁদিবে; কিন্তু এ শেষ বিদায়ের সময় তোমাকে কাঁদিতে দেখিয়া যাইলে স্বর্গেও আমি সুখী হইতে পারিব না। তুমি আমার নিকটে বস; আমি তোমাকে এই বেলা একবার প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লই, তোমাকে দেখিবার সাধ আজও আমার মেটে নাই।"

কিন্তু উপেন্দ্রের কথায় প্রিয়ম্বদার কান্না থামিল না, বরং বৃদ্ধি হইল। প্রিয়ম্বদা স্বামীর সে আজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ক্ষুদ্র হৃদয় কত সহ্য করিতে পারে? শোকে অধীরা হইয়া প্রিয়ম্বদা ভূমিতে আছাড় খাইয়া স্বামীর চরণ ধরিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিল— "আমায় ফেলিয়া যাইও না, যেখানে যাও, আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও আর তাহা না হইলে আমি আত্মঘাতী হইব।"

উপেন্দ্র পুনরায় বলিল—"প্রিয়ম্বদা, আমার জন্য যে তুমি আত্মঘাতী হইতে পার, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে তোমার আমার প্রতি যদি ভালবাসা থাকে তবে আমার এই শেষ আজ্ঞা রক্ষা করিও, তুমি আত্মঘাতী না হইয়া আমার পুত্র কন্যা লালন পালন করিও; বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিও, কখন তাঁহাদের অবাধ্য হইও না, ধীরেনকে তোমার পুত্রের ন্যায় দেখিও, আর জীবনের যে সকল উদ্দেশ্য ছিল, তাহাত তোমার অজ্ঞাত নাই, যতদূর পার সেই সকল উদ্দেশ্য পালন করিতে চেষ্টা করিও। নিজের শরীর ও মন পবিত্র রাখিয়া পরকালের কার্য্য করিও। এই সকল করিলে আবার আমাদের পুনরায় মিলন হইবে, সে মিলনের পর আর বিচ্ছেদ হইবে না।"

ধীরে ধীরে উপেন্দ্র এই কথাগুলি বলিল, ধীরে ধীরে প্রিয়ম্বদার কর্ণে গিয়া কথা গুলি প্রবেশ করিল, বালিকা সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। দেহের মধ্যে তখন তাহার প্রাণ ছিল না একবার নিরবে উদাস দৃষ্টে স্বামীর মুখের পানে চাহিল। অতৃপ্তলোচনে উপেন্দ্র সেই মুখ খানি শেষ দেখা দেখিতেছিলেন, বালিকার হতশার দৃষ্টি দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নিঃশব্দে নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। উন্মত্তের ন্যায় উপেন্দ্রের গলা জড়াইয়া প্রিয়ম্বদা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কতক্ষণ পরে উপেন্দ্র বলিল—"আমার সময় হইয়া আসিয়াছে। আর কাঁদিও না, একবার স্থির হইয়া ব'স, আমি দেখি।" চক্ষু মুছিতে মুছিতে বালিকা উঠিয়া বসিল। বাষ্পবিকৃতকণ্ঠে উপেন্দ্র বলিল,—"কৈ তোমার হাত?"

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়ম্বদা আপনার হাত খানি বাড়াইয়া দিল, ধীরে ধীরে উপেন্দ্র দুই হাতে সে হাতখানি ধরিয়া আপনার ওষ্ঠের উপর স্থাপন করিল, দুই বিন্দু উষ্ণ জল হাতের উপর গড়াইয়া পড়িল। সাদরে উপেন্দ্র সে হাত চুম্বন করিল। মর্ম্মের ভিতর হইতে উচ্চারণ করিয়া উপেন্দ্র বলিল—"আঃ।"

আর কথা সরিল না, চক্ষু কপালে উঠিল, নিশ্বাস অচল হইয়া গেল, তখনও হাতখানি সেই ওষ্ঠের উপর রহিল। বালিকা চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল; ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ দেবী-প্রতিমার মুখে কাল ছায়া দৃষ্ট হইল। ত্রস্তভাবে সকলে গৃহের দিকে দৌড়াইয়া গেল। দেখিল, বিজয়ার দিন ফুরাইতে না ফুরাইতে প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

কালরজনী।

আজ বিজয়ার দিন। বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে বিজয়া হইল। তিন দিনের আনন্দ ও উৎসবের পর সকল বঙ্গবাসী আজ শোকসাগরে ডুবিল। কিন্তু এই সকল বিজয়ার সহিত প্রিয়ম্বদার জীবনের বিজয়ার প্রভেদ অনেক। এ বিজয়ার পর বৎসরান্তে আবার সুখের সপ্তমী আসিবে, বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে আবার উৎসবের স্রোতঃ বহিবে, বঙ্গবাসী আবার আনন্দে মাতিবে; কিন্তু প্রিয়ম্বদার আজ যে বিজয়া হইল, তাহার সুখের সপ্তমী আর আসিবে কি? ভাঁটার পর জোয়ার হয়, জোয়ারের পর ভাঁটা হয় বটে, কিন্তু প্রিয়ম্বদার জীবন স্রোতে আজ যে ভাঁটা আরম্ভ হইল, তাহাতে আবার জোয়ার আসিবে কি? সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ সংসারের গতি এইরূপ বটে কিন্তু প্রিয়ম্বদা আজ যে দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহাতে আবার কূল পাইবে কি? প্রিয়ম্বদার ক্ষীণ জীবন-দীপ তখন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং এই সকল গুরুতর চিন্তারূপ ঝড়ে এক একবার নিভিবার উপক্রম হইতেছিল। হঠাৎ প্রিয়ম্বদার স্বামীর শেষ কথা মনে পড়িল, স্বামীর শেষ আজ্ঞা পালনের গুরুত্ব প্রিয়ম্বদা সে অবস্থাতেও কতক বুঝিল, জীবনের সেই ক্ষীণালোক আর নিবিতে দিল না,—সতীর স্বামীর অনুগমন করা হইল না। স্বামীর আজ্ঞা পালনের জন্য প্রিয়ম্বদার জীবন রহিল বটে, কিন্তু সে জীবনের সুখ, উৎসব, আশা, ভরসা সকলি স্বামীর অনুগমন করিল।

পরিবারের মধ্যে সকলেই শোকে অধীর, সকলেরই প্রাণের ভিতর কি যেন একটা ভয়ানক জ্বালা জ্বলিতেছিল। এই আকস্মিক বিপদে সকলেই একেবারে শোকে অভিভূত। আত্মীয় স্বজনেরা সান্ত্বনা করিতে গিয়া আপনারাই শোকে অধীর হইতেছে। এমন বিপদের সময় বঙ্গালিদের বুক না বাঁধিলে চলে না—সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, এই রাত্রেই মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে, উপেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ পৃথিবী

হইতে লোপ করিতে হইবে, কারণ প্রত্যূষে উপেন্দ্রনাথের দেহ এ পৃথিবীতে আর কেহ দেখিতে পাইবে না!! রামগোপাল মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল—"বাবা মহেন্দ্র, আমার উপেনের শোক বড় লাগিয়াছে,আমার দ্বারা আর কোন কার্য্য হইবে না, তুমি সে বিষয়ে উদ্যোগ কর।" বিষয় যে কি তাহা রামগোপাল স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না। মহেন্দ্রকে তাহার জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইল না, প্রতিবাসীরা ইতিপূর্ব্বে তাহার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাহারা শব উঠাইতে গেল, কিন্তু শব উঠান হইল না, উন্মাদিনীবেশে তখন দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া শবের উপর পড়িল, একজন হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে গগন ফাটাইয়া চিৎকার ছাড়িতেছে—"বাবারে, তুই আমাদের ফেলিয়া কোথায় চল্লি রে।" আর একজনের মুখে চিৎকারের শব্দমাত্র নাই, যেরূপ ভাবে আসিয়া শবের উপর পড়িয়াছে, বুঝি দেহেতে প্রাণও নাই। উপেন্দ্রের মাতার চিৎকার ধ্বনি উঠিতে না উঠিতেই স্ত্রীলোক মাত্রেই সেই চিৎকারের সহিত যোগ দিল, সেই সকল হৃদয়বিদারক ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কেহই সেই মৃতদেহের উপর আর একটি মৃতপ্রায় নিষ্পন্দ স্ত্রীমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিল না; কেবল ধীরেন্দ্রের সে দিকে লক্ষ্য ছিল। অনেক কষ্টে ধীরেন্দ্র প্রিয়ম্বদার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল।

আর বিলম্ব করা উচিত নয়, বিবেচনা করিয়া সকলে শব উঠাইল। সে কাল রাত্রে গ্রামের অনেকেই গৃহে রহিল না—নিরবে শবের সঙ্গে সঙ্গে শশ্মানে চলিল। যতক্ষণ উপেন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সুযোগ অনেকের ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। যাহারা গৃহে রহিল, তাহারা সে কালরাত্রে নিদ্রা গেল না। গ্রামের কুলবধূগণ যাহারা এ পর্য্যন্ত উপেন্দ্রকে কখন দেখে নাই, তাহারাও আজ নিরবে রোদন করিয়া শয্যা ভিজাইতেছিল। ক্রমে শব গ্রামের মধ্যে চলিল, তখন সেই গভীরা রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে "বল হরি, হরি বোলের" ধ্বনি উঠিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে গ্রামস্থ রমণীগণের হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ ও মিশিতেছিল। অনেকে গৃহত্যাগ করিয়া সেই শোকাবহ-দৃশ্য দেখিতে মনের আবেগে রাস্তায় দৌড়িয়া আসিল, যাহারা আসিতে পারিল না, তাহারা গবাক্ষ খুলিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মশালের আলোকে যতদূর

পারিল উপেন্দ্রকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চেষ্টা করিল। শববাহকেরা সে দৃশ্য দেখিয়া এতদূর শোকে অধীর হইল যে শববহন করা বুঝি তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া ভার হইল। অনেকেরই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, হরি বোলের ধ্বনি পর্য্যন্ত আর শুনিতে পাওয়া গেল না। এইরূপে গ্রাম পার হইয়া নদী-তীরস্থ শশ্মানে সকলে আসিয়া পৌঁছিল।

আজ এই শশ্মানে উপেন্দ্রের মৃতদেহ দাহ হইবে! এই কালরজনীর শেষ হইতে না হইতে আজ এই মাটিতে তাহার দেহ মিশিবে! সংসারের সেই অমূল্যরত্ন আজ এইখানে ভস্মীকৃত হইবে! শশ্মানে আসিয়া সকলেরই মনে এই কথার উদয় হইতেছিল। সকলেই বিষণ্নমনে নিরবে সেই শেষ কার্য্যের উদেযাগ করিতেছিল। ক্রমে চিতা প্রস্তুত হইল, তখন উপেন্দ্রনাথের সেই মৃত্যুবিবর্ণীকৃত দেহের প্রতি সকলে একবার আগ্রহের সহিত চাহিল, সকলে-রই মন শোকে আকুল হইল। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দুই জন শব তুলিয়া চিতায় উঠাইয়াদিল। দেখিতে দেখিতে ধু ধু শব্দে চিতা জলিয়া উঠিল। সমা-জের একটি অমূল্যরত্ন আজ এই চিতায় ভস্ম হইল। কালরজনী প্রভাত হইলে সকলে বিষণ্ন মনে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রূপান্তরে।

[illegible] রজনীর প্রভাত হইল বটে, কিন্তু আজিকার প্রভাতের বায়ু বলি-[illegible]—উপেন্দ্র নাই! প্রভাতের পক্ষীগণ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতেছে, [illegible] চিৎকার আজ বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! সূর্য্য উঠিয়াছে, সূর্য্যের [illegible]লোকিরণ আজ বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! গ্রামের কৃষকেরা আজ [illegible]ভাতে মাঠে যায় না, তাহাদের সেই বিষণ্ন মুখ আজ বলিতেছে—[illegible] নাই! [illegible]ত্র লোকেরা আজ প্রভাতে আর সাংসারিক কার্য্যে [illegible]ছে না; তাহাদের চক্ষের জল আজ বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! [illegible] দেখ, সেই দিকেই যেন কোথা হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—

উপেন্দ্র নাই! বাস্তবিক কি উপেন্দ্র নাই? মিথ্যা কথা।—উপেন্দ্র আছে! এ পৃথিবীতে না থাকিলেও উপেন্দ্র স্বর্গে আছে। এই কথা কেবল প্রিয়ম্বদা ভাবিতেছিল, কারণ যাইবার সময় উপেন্দ্র তাহাকে পুনর্মিলনের কথা বলিয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রের কোন কথায় প্রিয়ম্বদার অবিশ্বাস হইতে পারে কি? কিন্তু কৈ, উপেন্দ্রের সেই হাসি হাসি মুখ, সেই সরল প্রেমময় মূর্ত্তি নড়িতে চড়িতে প্রিয়ম্বদা আর তো দেখিতে পাইতেছে না, সেই অমৃতময় কথা যাহা শুনিতে শুনিতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত, কত নিশা জাগরণে কাটিত, সে কথা তো আজ আর তেমন করিয়া কর্ণে মধু ঢালিয়া দিতেছে না। এ পৃথিবীর কাল যেখানে যা ছিল, আজও ঠিক্ সেখানে তাই রহিয়াছে, তবে চারি দিক্ আজ এত শূন্যময় কেন? বালিকার সেই আধ আধ কথা, বালকের অর্দ্ধস্ফুট মা মা ধ্বনি কেন আজ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে না, কোথায় পুত্র, কোথায় কন্যা—এত বেলায় কে তাহাদের আহার দিল, কেন আজ প্রিয়ম্বদার সে সব প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই? প্রিয়ম্বদা ভাবিতেছে, উপেন্দ্র বলিয়াছে আবার মিলন হইবে, কিন্তু সে কবে? কত দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিয়া এই পোড়া দেহভার বহিতে হইবে? যত দিন থাকিতে হইবে তত দিন তো আর উপেন্দ্রের দেখা মিলিবে না। যদি উপেন্দ্রের দেখাই না মিলিল, তবে আর এ জীবনে সুখ কি? এ সব সুখের চিহ্ন কেন? হঠাৎ কি মনে করিয়া প্রিয়ম্বদা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রিয়ম্বদা আপনার অঙ্গের আভরণ সকল খুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। এখন সে সকল আভরণ তাহার শরীরে যেন শেল স্বরূপ বিঁধিতেছিল। প্রিয়ম্বদার আর বিলম্ব সহ্য হয় না, নত খুলি[illegible]নাক ছিঁড়িল, মাকড়ি খুলিতে কান ছিঁড়িল, বালা খুলিতে হাত ছিঁড়িল, [illegible] খুলিতে পা ছিঁড়িল. এই রূপে সমস্ত অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রিয়ম্বদা স[illegible] অলঙ্কারবিহীনা হইল। তাহার পর এক খানি থান পরিল। কি ভা[illegible], শয়নগৃহের চারিদিকে একবার চাহিল। হঠাৎ দেয়ালস্থ দীর্ঘ দর্পণে আপ[illegible]র বিষাদময়ী মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিল। সে প্রতিবিম্বকে এখনও সুন্দরী [illegible] তাহার বোধ হইল। প্রিয়ম্বদা আবার অধীরা হইল। একবার [illegible] গললগ্নকৃতবাসে করযোড়ে বলিল——

"প্রভো! এখন আর আমি পোড়া রূপ লইয়া কি করিব? দয়া করিয়া আমার রূপান্তর করিয়া দাও, আমি যেন তোমার দয়ায় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা কুরূপা ও কুৎসিতা রমণী হই, প্রভো! দাসীর এই ভিক্ষা রাখিও।"

তাহার পর কি মনে করিয়া সেই দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক খানি কাঁচি লইয়া প্রিয়ম্বদা আপনার সেই ভ্রমরলাঞ্ছিত, নিবিড়কৃষ্ণ, আগুল্ফলম্বিত সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ কাটিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রিয়ম্বদার চরণতলে রাশীকৃত কেশ স্তূপাকার হইল। আজ তাহার সেই অতি যত্নে রক্ষিত মস্তকের কেশদাম চরণে দলিত হইয়া ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল।

এই সময় দরজা ঠেলিয়া চপলা গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র চপলা স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিল—আশ্চর্য্য রূপান্তর। উচ্চৈঃস্বরে চপলা কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর উভয়ে অনেকক্ষণ উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

কিছুক্ষণ পরে চপলা বলিল—"দিদি, এখনি তোমার এ বেশ কে করিল?"

প্রিয়ম্বদা উত্তর করিল—"ঈশ্বর করিয়াছেন বোন্।"

এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য ঈশ্বর যে করিতে পারেন, চপলার তাহা বিশ্বাস ছিল না, এখন এ কথা শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতিও চপলার বড় রাগ হইল, চপলা বলিল—

"তাঁহার শরীরে কি দয়া নাই? তিনি কি এতই নিষ্ঠুর?"

"তাঁহার শরীরে দয়া যথেষ্ট আছে, তিনি নিষ্ঠুর নন—তিনি দয়ার সাগর। কিন্তু আমার যে অদৃষ্ট মন্দ বোন্।"

চপলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু প্রিয়ম্বদার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিল।

এইরূপে উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ২।৩ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। বেলা দুই প্রহরের সময় ধীরেন্দ্র উপেন্দ্রের কন্যা সরোজিনী এবং খোকাকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ গৃহের মধ্যে সে দৃশ্য দেখিয়া ধীরেন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, অনেকক্ষণ ধীরেন্দ্র চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি সে দৃশ্যের অর্থ বুঝিলেন; কি[illegible]ই যে তাঁহাকে এ দৃশ্য দেখিতে হইবে, তাহা তাহার মনেও উদয় হয় নাই। প্রিয়ম্বদা দুই সন্তানের জননী হইলেও আজও প্রিয়ম্বদা বালিকা।

এই বয়সেই যে প্রিয়ম্বদা কঠিন বৈধব্যব্রত অবলম্বন করিতে পারিবে সে কথা তখন কাহারও মনে হয় নাই। কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরেন্দ্র সরোজিনী আর খোঁকাকে প্রিয়ম্বদার কোলে দিতে গেল; কিন্তু বালক বালিকা আজ আপনার জননীকে চিনিতে পারিল না, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মকথা।

উপন্যাসের প্রথমেই আমরা এই শোকাবহ ঘটনার বর্ণনা করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের মনে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছি সেই জন্য এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে দুই কথা বলিব। উপেন্দ্রকে এত শীঘ্র কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় দেওয়ায় অনেকেই গ্রন্থকারকে অপরাধী মনে করিতে পারেন, কারণ উপেন্দ্রের চরিত্রগঠণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বাস্তবিক গ্রন্থকারকে উপেন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া আরম্ভ করিতে করিতেই শেষ করিতে হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের ইহাতে অপরাধ কি? সংসারে এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সংসারের প্রকৃত চিত্র দেখানই তাহার উদ্দেশ্য, তখন এই বিষয়ে দোষী কে?

ঐ সম্মুখের গোলাপ গাছটিতে অনেক কলিকা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সকলগুলিই কি প্রস্ফুটিত হইল? তাহাদের কতকগুলি কলিকাবস্থাতেই কীটভ্রংষ্ট হইল কেন? আজ যদি সকলগুলি প্রস্ফুটিত হইত তাহা হইলে না জানি গাছটির কত শোভাই হইত, কিন্তু কি জানি কেন তাহা হয় না। সেই-রূপ এই সংসারে অনেক উপেন্দ্র জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কি জানি কেন তাহারা এ পাপ সংসারে অধিক দিন থাকিতে পায় না।

এখন অনেকেই বলিতে পারেন, কি অপরাধে প্রিয়ম্বদার এই দশা হইল? সেই পরদুঃখকাতর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এ শেল বিঁধিল কেন? কেন আজ তাহার চিরপ্রফুল্ল মুখকমল চিরজীবনের জন্য শুষ্ক ও মলিন হইল? যে অনন্ত সুখের

চক্ষে বিন্দুমাত্র অশ্রু দেখিলে কাঁদিয়া গলিয়া যাইত, সেই নিতান্ত কোমল, হৃদয়ে এই নিদারুণ আঘাত কেন? পাঠক-পাঠিকাগণ মাত্রেই সকলের হৃদয় প্রিয়ম্বদার জন্য ব্যথিত হইয়া থাকিবে; আমরাও প্রিয়ম্বদার জন্য বিশেষ দুঃখিত; কিন্তু কি করিব প্রিয়ম্বদার অদৃষ্টের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

আর এক কথা অগ্নিতেই স্বর্ণের পরীক্ষা হইয়া থাকে, প্রিয়ম্বদার পরীক্ষাও সেইরূপে হইবে। প্রিয়ম্বদা সোনা কি রাং এই বৈধব্যযন্ত্রণারূপ অগ্নিতে পোড়াইয়া আমরা তাহা পরীক্ষা করিব। যে ধাতুতে প্রেম প্রতিমার গঠন হইবে, আমরা আজ তাহার আভাস দিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উপবাসে।

বিজয়ার পরদিবস যে একাদশী প্রিয়ম্বদা তাহা জানিত, এবং একাদশীর দিন বিধবাকে যে জলস্পর্শ করিতে নাই, তাহাও প্রিয়ম্বদার অবিদিত ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রে এই বিধি থাকিবার উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, কিন্তু আজ প্রিয়ম্বদা মনে করিল যে এই দিনে আহার নিদ্রা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মৃতস্বামীর চরণ ধ্যান করিতে হয়। পূজার তিন দিবস প্রিয়ম্বদাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার পর গতকল্য হইতে শোকে, অনাহারে ও অনিদ্রায় প্রিয়ম্বদা অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সে অবস্থায় একাদশীর উপবাসে তাহার জীবন থাকিবে কিনা সন্দেহ ছিল। প্রিয়ম্বদার শরীর দুর্ব্বল হইলেও প্রিয়ম্বদা আজ হৃদয়ের বলে বলবতী—সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বামীভক্তি এখন দ্বিগুণ হইয়াছে, সুতরাং উপবাসে প্রিয়ম্বদার জীবনহানির প্রতি সন্দেহ নাই। উপেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে প্রিয়ম্বদা এ অবস্থায় একাদশী করিতে পারিবে না, সে কথা তাহার একবার মনে উদয় হয় নাই।

কি ভাবিয়া প্রিয়ম্বদা আবার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, ইতিপূর্ব্বে

ধীরেন্দ্র ও চপলা তাহার পুত্র কন্যাকে লইয়া গৃহান্তরে গিয়াছিল। দরজা বন্ধ করিয়া প্রিয়ম্বদা মৃতপতির চরণধ্যানে নিযুক্ত হইল। অলঙ্কারবিহীনা, শুভ্রবস্ত্রপরিধানা সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে স্থির ও নিস্পন্দ হইল, সেই আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ক্রমে ক্রমে মুদিত হইল। প্রিয়ম্বদা তখন মূহুর্ত্ত-মধ্যে সংসার ভুলিল, শোক ভুলিল, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন সমস্ত ভুলিয়া প্রিয়ম্বদা উপেন্দ্রধ্যানে উপেন্দ্রময় হইয়া গেল। বালিকা কখন যোগাভ্যাস করে নাই, যোগ যে কি তাহাও বালিকা জানে না, তবে কেন যে এরূপ হইল তাহা আমরা জানি না।

এইরূপে তিন চারি ঘন্টা কাটিয়া গেল, তত্রাচ শাড়া নাই, শব্দ নাই, দেহে বুঝি প্রাণও নাই, কারণ তাহার কোন লক্ষণই এখন দেখা যাইতেছে না। প্রিয়ম্বদা একমনে একপ্রাণে উপেন্দ্রধ্যানে উন্মত্ত। সুখ ও সম্পদ, শোক ও দুঃখ, দেহ ও মন সমস্তই প্রিয়ম্বদা সেই স্বামী-চরণধ্যানে উৎসর্গ করিল। সেই ধ্যানে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এমন সময় কে গৃহের দরজায় আঘাত করিল। কিন্তু প্রিয়ম্বদার সংজ্ঞা ছিল না, সেইজন্য সে আঘাতের প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই, একমনে একপ্রাণে সেই স্বামী চরণ ধ্যানে প্রিয়ম্বদা তন্ময় হইয়া গিয়াছে। আঘাৎ প্রথমে ধীরে ধীরে হইতেছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া এখন জোরে আঘাৎ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে প্রিয়ম্বদার চৈতন্য হইল, তখন উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ধীরে ধীরে চপলা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। চপলার মুখ শুষ্ক, হৃদয় উদাস, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। মস্তক নত করিয়া চপলা প্রিয়ম্বদার নিকটে বসিল, কারণ সেই বিষাদময়ী প্রতিমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে চপলার ক্ষমতা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া চপলা বলিল—"দিদি বেলা যে আর নাই, স্নানাহার করিবে আর কখন?"

প্রিয়ম্বদা উত্তর করিল—"আজ যে আমার একাদশী বোন্।"

একথা কি জানি কেন চপলার হৃদয়ে বড় বাজিল, সে ক্ষুদ্র হৃদয় আর কত সহ্য করিতে পারে? বালিকা কথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। অনেক কষ্টে পুনরায় বলিল "দিদি, পারিবে কি?"

প্রিয়। কেন পারিব না বোন, ধর্ম্মে যদি আমার মতি থাকে আর

সেই স্বর্গীয় স্বামীর চরণে যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে আমি কেন পারিব না বোন্?

চপলা। জেঠাইমা বলিতেছেন, আহার না কর, কিছু জল খাও।

প্রিয়। আমি যে চরণ ধ্যান করিয়াছি, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; চপলা, যখন সেই সর্ব্বগুণাধর স্বামীর চির বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিয়াছি, তখন আর সেই স্বামীর উদ্দেশে একাদশী করিতে পারিব না?

চপলা। দিদি, তোমার শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহার উপর আজ একাদশী করিলে কি আর তোমার জীবন থাকিবে?

প্রিয়। আমার জীবনেই আর কাজ কি বোন্?

চপলা। ওকথা কি মুখে আনিতে আছে, সরোজিনী আর খোকা বেঁচে থাকুক, তুমি তাহাদের নিয়ে সুখী হইতে পারিবে।

প্রিয়। চপলা, সুখ আর আমার অদৃষ্টে নাই, খোকা আর সরোজিনী বেঁচে থাকুক, কিন্তু আমি যে তাহাদের দ্বারা সুখী হইব, সে আশা আর আমার নাই।

চপলা। তুমি নিজের দেহ নষ্ট করিতে বসিয়াছ, তবে তাহারা বাঁচিবে কিরূপে?

প্রিয়। এদেহ আমার নয়, বহুদিন পূর্ব্বে এ দেহ, মন, প্রাণ যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছি, তিনি পৃথিবীতেই থাকুন আর স্বর্গেতেই থাকুন, এদেহ তাঁহারই। যতদিন বাঁচিব তাঁহারই কার্য্যে এ দেহ উৎসর্গ করিব। চপলা, তোমায় আমি ছোট ভগ্নির ন্যায় ভালবাসি; খোকা আর সরোজিনীকে আমি আজ হইতে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, তুমি তাহাদিগকে দেখিও যদি ঈশ্বর বাঁচিয়া রাখেন, তবে তাহারা তোমারই। আমার দ্বারা তাহাদের ভালরূপ লালন পালন আর হইতে পারে না। আমি তাঁহার শেষ আজ্ঞা রক্ষা করিব, সে কথা এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে; ইচ্ছা করিয়া এদেহ নষ্ট করিব না, কিন্তু যদি জীবনের উদ্দেশ্যপালনে এ দেহ নষ্ট হয়, শোন চপলা, যদি আমার সে শুভ দিন হয়, তাহাতে কেহ যেন বাধা না দেয়।

প্রিয়ম্বদা স্থিরহৃদয়ে এই সকল কথা বলিল বটে, কিন্তু আর পারিল না,

আবার তাহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। আবার কোথা হইতে অশ্রু তাহার চক্ষে দেখা দিল। বিন্দুর পর বিন্দু আসিয়া আবার ঝরিতে আরম্ভ করিল। চপলা ধীরে ধীরে চক্ষের জল মুছাইতে লাগিল। কিছু স্থির হইয়া প্রিয়ম্বদা আবার বলিল—"তাঁহার এত গুণ কেন হইয়াছিল চপলা, আজ যে আমার একে একে সকল কথাই মনে হইতেছে।"

চপলা কোন কথা আর কহিতে পারিল না, কেবল অন্যদিকে মুখ ফেরাইয়া আপনার চক্ষু মুছিতে লাগিল। এই সময় কর্ত্তা গৃহিণী ও ধীরেন্দ্র প্রভৃতি আসিল। সকলেই প্রিয়ম্বদাকে এ অবস্থায় একাদশী করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু প্রিয়ম্বদা সকলকেই মিনতি করিয়া বলিল যে উপবাসে তাহার কোন কষ্টই হইবে না। বরং উপবাস করিতে না দিলে তাহার জীবন হানি হইবারই সম্ভব। আরও বিধবার একাদশীর দিন উপবাস না করিলে অধর্ম্ম হইবে, সুতরাং তাহাকে ধর্ম্মপথে রাখা যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে এরূপ কথা আর যেন তাঁহারা মুখে না আনেন।

প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া কেহ তাহাকে আর অধিক জেদ করিল না, সকলেই বিষণ্ণ মনে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। চপলাও সে স্থান ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় সরোজিনী আর খোকাকে লইয়া পুনরায় আসিল, এবং তাহাদের ঘুম পাড়াইয়া সমস্ত রাত্রি প্রিয়ম্বদাকে লইয়া জাগিয়া বসিয়া রহিল।

ত্রয়দশ পরিচ্ছেদ।

গুরুতর পরীক্ষা।

চপলা সে রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে নাই, কারণ প্রিয়ম্বদা নিদ্রা যায় নাই। প্রিয়ম্বদা সমস্ত রাত্রি কেবল উপেন্দ্র ধ্যানে মগ্ন ছিল, উপেন্দ্র কোন্ দিন কি ভাল কথা বলিয়াছিল, কোন্ দিন কি উপদেশ দিয়াছিল, এই সকল একে একে বালিকার আজ স্মরণ হইতেছিল। প্রিয়ম্বদার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, সে যতদিন বাঁচিবে যদি ধর্ম্মপথে থাকিয়া স্বামীর উপদেশ সকল পালন করিয়া

উঠিতে পারে, তবে নিশ্চয় আবার তাহাদের পুনর্মিলন হইবে। উপেন্দ্র যে যাইবার সময় পুনর্মিলনের কথা বলিয়াছিল বালিকা তাহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছিল, কারণ উপেন্দ্রের কথার উপর কখন বালিকার অবিশ্বাস হইতে পারে না। প্রিয়ম্বদার জীবনের আশা, ভরসা, সুখ ও সম্পদ এখন এই পুনর্মিলনের উপর নির্ভর করিতেছে, সেই ভাবী আশায় আজিকার নিদারুণ একাদশীর উপবাসেও বালিকার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই! ভারতের হিন্দু-রমণী ভিন্ন জগতের কোন রমণী এরূপ পারে কি? জগতে অনেক সভ্য জাতি আছে সত্য, কিন্তু এরূপ কোথাও দেখিয়াছ কি?

ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, তত্রাচ প্রিয়ম্বদার চক্ষে নিদ্রা নাই, বালিকা একমনে ভাবিতেছিল, যত দিন তাহাকে উপেন্দ্র বিচ্ছেদে এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, ততদিন তাহার পরীক্ষার দিন; এই পরীক্ষায় জয়ী হইতে পারিলে, তবে মরণান্তে পুনরায় উপেন্দ্রের সহিত আবার মিলন হইবে। মধ্যে মধ্যে বালিকা সেই স্বর্গমিলনের সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল তাহাতেই মুহূর্ত্তমধ্যে সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে প্রভাত হইল তখনও বালিকার সেই চিন্তা— জীবনের এই গুরুতর পরীক্ষায় কিসে জয়ী হইবে।

প্রভাতে সকলেই আগ্রহের সহিত প্রিয়ম্বদাকে স্নান আহার করাইবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু তাহার জন্য প্রিয়ম্বদার সেরূপ কিছুই আগ্রহ ছিল না। বালিকার আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। প্রিয়ম্বদা স্নানাদি করিয়া প্রথমে দেবার্চ্চনা করিল; এক মনে এক প্রাণে আপনার ইষ্টদেবকে জানাইল, যাহাতে এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারে। তাহার পর কিছু জলযোগ করিল।

প্রভাতে প্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রিয়ম্বদাকে দেখিতে আসিল, তাহারা প্রিয়ম্বদার সেইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। চক্ষের অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে সকলেই হৃদয়ের সহিত তাহাকে ধন্যবাদ দিল। সেই দিন গ্রামের মধ্যে প্রিয়ম্বদার কথা লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। কেহ বলিল—"প্রিয়ম্বদা সাক্ষাত ভগবতি, দেহে কোনরূপ অলঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, পরিধানে একখানি থানবস্ত্র, মস্তকে চুল পর্য্যন্ত নাই, শোকে অনাহারে অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ, তত্রাচ এখন ও এত সুন্দরী

দেখায় কেন? এইরূপ অবস্থায় এত রূপত আমরা কখন ও দেখি নাই।" কেহ বলিল—"প্রিয়ম্বদা নিশ্চয় কোন দেবী হইবে, হয়ত সতী সাবিত্রী বা সীতা পুনরায় আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা না হইলে এরূপ স্বামী ভক্তি কখন সম্ভবে না।" আবার কেহ বলিল—"ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর, এমন সতীসাবিত্রীর কি এমন করিয়া কপাল পোড়াইতে হয়।" এইরূপ নানা প্রকার অন্দোলন চলিতে লাগিল।

এইরূপে প্রিয়ম্বদা প্রতি একাদশীর দিন আর কোন কার্য্য করিত না, স্নেহের পুত্তলী সন্তান সন্ততির প্রতি ও সেদিন তাহার লক্ষ্য থাকিত না। একমনে একপ্রাণে কেবল স্বামীর চরণ ধ্যান করিত, আর কিরূপে এই গুরুতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে কেবল সেই কথাই ভাবিত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে সেইকাল রজনীর দিন হইতে একমাস অতীত হইয়া গেল, এই একমাসের মধ্যে যাহারা উপেন্দ্রের শোকে একবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই শোক কতক পরিমাণে নিবারণ হইল। আবার সকলে নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করে, বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ করে, সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। যদি শোক চিরদিন সমভাবে থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে কেহ থাকিতে পারিত কি? ঈশ্বর সেই জন্য দয়া করিয়া মনুষ্যহৃদয় যে ধাতুতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে শোক চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারে না। এইরূপ না হইলে আজ সংসার শ্মশানভূমিতে পরিণত হইত।

ধীরেন্দ্র এই একমাস কাল গৃহে রহিয়াছে, পাঠকগণের স্মরণ আছে যে এই বৎসর তাহার ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষার বৎসর। সে পরীক্ষারও আর এক সপ্তাহ কাল মাত্র বিলম্ব আছে, সুতরাং তাহার আর গৃহে থাকা উচিত হয় না। ধীরেন্দ্র ছোটদাদার শোকে এত দিন অধীর ছিল, সেই জন্য পরীক্ষার

কথাও তাহার স্মরণ ছিল না, কিন্তু এখন সে শোকের কিছু উপসম হইলে, তাহার পরীক্ষার কথা স্মরণ হইল। এখন আবার কলিকাতায় আসিবার ইচ্ছা হইল, সেই জন্য ধীরেন্দ্র জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইবার মনস্থ করিল। ধীরেন্দ্র জ্যেষ্ঠতাতকে বড় ভয় করিত, সম্মুখে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। সেই কারণ অপর একজনের দ্বারা অপনার ইচ্ছা তাঁহাকে জানাইল। কিন্তু সেই ব্যক্তি যে সংবাদ আনিয়া দিল, তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, ধীরেন্দ্র তাহার মুখে শুনিল যে তাহাকে আর কলিকাতায় যাইতে হইবে না, এখন হইতেই তাহাকে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইবে। কলিকাতায় লেখা পড়া শিখিতে ব্যয় অনেক, এখন আর তাহার সে ব্যয় দিবে কে? বাস্তবিক ধীরেন্দ্র জ্যেষ্ঠতাতের কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল।

বিষণ্ণ মনে ধীরেন্দ্র একবার মহেন্দ্রের নিকট গেল, এবং তাহাকে আপনার ইচ্ছা জানাইয়া কর্ত্তাকে অনুরোধ করিতে মিনতি করিল, কিন্তু মহেন্দ্র কর্ত্তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা ধীরেন্দ্র নিজেই কর্ত্তার নিকট আপনার ইচ্ছা জানাইবার মনস্থ করিল। কর্ত্তা তখন আহারান্তে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন, তথায় কেহ নাই দেখিয়া ধীরেন্দ্র নিকটে গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ধীরেন্দ্র বহুকষ্টে বলিল —"জ্যেঠা মহাশয়, আমাদের পরীক্ষার আর এক সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব আছে।"

কর্ত্তা। আমি সে কথা শুনিয়াছি, আর আমার যাহা অভিপ্রায় তাহাও বলিয়াছি, তুমি কি তাহা শোন নাই?

ধীরেন্দ্র। তবে কি আমার আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না, ইহাই আপনি স্থির করিয়াছেন?

কর্ত্তা। কলিকাতায় থাকিতে ব্যয় অধিক হইবে, এখন তোমার সে ব্যয় দিবে কে?

ধীরেন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে মস্তক নত করিয়া বলিল— "কেন আপনি?"

কর্ত্তা। আমি সে ব্যয় কিরূপে দিতে পারি, আমার গলায় এতগুলি পরিবার, ইহাদের ভরণ পোষণ করাই দুঃসাধ্য। আর লেখা পড়া তোমার

একরূপ শেখা হইয়াছে; আর অধিক শিখিয়াই বা কি হইবে? এখন বরং উপায়ের চেষ্টা কর। আমি এতদিন তোমাদিগকে খাওইয়া মানুষ করিলাম, এখন আমার ক্রমে বয়স হইতেছে, সংসারে আর আমার মন নাই। বিশেষত উপেন্দ্রের শোক আমার বড় লাগিয়াছে। আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই ৺কাশীধামে যাইবার মনস্থ করিয়াছি। যাইবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে উপায়ক্ষম দেখিয়া যাইতে পারিলে সুখী হইব।

ধীরে। দুইবৎসর পরিশ্রম করিয়াছি, পরীক্ষার টাকা ও জমা দেওয়া হইয়াছে, সেই জন্য পরীক্ষা দেবার আমার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে। ১০।১৫ দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিলেই পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে, পরে যাহা ভাল হয় করিব। কিন্তু এখন আমায় পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা করুন, আর ১০।১৫ দিন কলিকাতার থাকিতে অধিক কিছু ব্যয় হইবে না।

কর্ত্তা। যখন লেখা পড়া শেখা তোমায় বন্ধ করিতে হইবে, তখন আর পরীক্ষা দেওয়ার ফল কি?

কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, এই সময় ছোট দাদার কথা তাহার মনে হইল, উপেন্দ্র তাহাকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছিল, একে একে সেই সকল উপদেশ এখন তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে পারিল না, অকস্মাৎ কোথা হইতে অশ্রুজল আসিয়া তাহার চক্ষু পরিপূর্ণ করিল। ক্রমে সে জল আর চক্ষুতে রহিল না, বিন্দুর পর বিন্দু আসিয়া গণ্ডদেশ, চিবুক বক্ষঃস্থল ভিজাইতে লাগিল। কর্ত্তা তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া রামায়ণ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। নিরবে ধীরেন্দ্র অনেকক্ষণ কাঁদিল, কিন্তু সে কান্নার কোন ফল হইল না। পরে কর্ত্তা কিছু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—

"আমি তোমার ভালর চেষ্টাই করিতেছি, তুমি যদি আমার অবাধ্য হইয়া কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, তুমি স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় যাইতে পার।"

ধীরেন্দ্র আর তথায় থাকিল না। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার জীবনে যে সকল উচ্চাভিলাষ ছিল, আজ হইতে সমস্ত ফুরাইল। ধীরেন্দ্র জ্যেষ্ঠভ্রাতের কথায় অবাধ্য না হইয়া গৃহে থাকিতেই

মনস্থ করিল। তাহার পর কি ভাবিয়া ধীরেন্দ্র সদর বাড়ি হইতে অন্তঃপুরে আপনার শয়নগৃহে চলিল। শয়নগৃহে যাইবার সময় প্রিয়ম্বদা ধীরেন্দ্রের বিষণ্ণমুখ দেখিতে পাইল। যদিও প্রিয়ম্বদা এখনও কেবল আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিত, অন্য কোন কার্য্যে তাহার মন আকর্ষিত হইত না, তথাচ ধীরেন্দ্রের মুখ ওরূপ বিমর্ষ দেখিয়া প্রিয়ম্বদা আর থাকিতে পারিল না। কারণ জানিবার জন্য কিছুক্ষণ পরেই ধীরেন্দ্রের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। প্রিয়ম্বদা গিয়া দেখিল যে ধীরেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া নিরবে কাঁদিতেছে। শয্যার নিকটে গিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল—

"ধীরেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন ভাই?"

ধীরেন্দ্র চক্ষের জল গোপন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, কিন্তু প্রিয়ম্বদার নিকট ধীরেন্দ্রর সে চেষ্টা বৃথা হইল। প্রিয়ম্বদা পুনরায় বলিল—"তুমি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিও না।"

ধীরে। আপনাকে কোন কথা গোপন করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সকল কথা আপনাকে বলিয়া আপনার মনে কষ্ট দেওয়া কি আমার উচিত?

প্রিয়। আমি মনে কষ্ট পাইতে পারি, এমন কথা কি আছে ধীরেন?

ধীরে। আমি জানি কাহার কোনরূপ দুঃখের কথা শুনিলেই আপনার মনে কষ্ট হয়, সেই জন্য সকল কথা আপনার শুনিবার আবশ্যক নাই।

প্রিয়। আমি বুঝিয়াছি, পরের দুঃখ মোচন করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই, তুমি আমায় এসকল কথা শুনিতে নিষেধ করিতেছ। কিন্তু ধীরেন্, আমি তোমার চক্ষে জল দেখিয়াছি, তোমার মুখখানি বিষণ্ণ দেখিয়াছি, এ সকল দেখিয়াও কি আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তুমি কেন আমার নিকট এখনও সে কথা গোপন করিতেছ?

অগত্যা ধীরেন্দ্র আর সে কথা গোপন করিতে পারিল না, জ্যেঠতাত তাহার লেখাপড়া সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন সেই সমস্ত কথাই ধীরেন্দ্র প্রিয়ম্বদাকে জানাইল এবং বলিল—"আমি কাহার উপর দুঃখ করি না, দুঃখ আর কাহার উপর করিব? আমি লেখা পড়া আর শিখিতে পাইব না বলিয়া কাঁদি নাই। আজ এই ঘটনায় আমার অনেক কথা মনে উদয় হইতেছে, প্রাণ আপনাপনি কাঁদিয়া উঠিতেছে।"

প্রিয়। আর তোমায় বলিতে হইবে না, তুমি যে জন্য কাঁদিতেছিলে এখন আমি বুঝিয়াছি। ধীরেন, তুমি আজই কলিকাতায় যাও, কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে যে কিছু ব্যয় হইবে, আমি তোমায় দিব।

ধীরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইয়া প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রিয়ম্বদা পুনরায় বলিল—"আমার কথায় কি বিশ্বাস হয় না ধীরেন?"

ধীরে। আপনি সে খরচ দিতে কোথায় পাইবেন?

প্রিয়। আমার নিকট নগদ টাকা যদিও সামান্যই আছে বটে, কিন্তু আমার সমস্ত গহনা বিক্রয় করিলে অনেক টাকা হইবে তাহাতে কি তোমার খরচ চলিতে পারে না?

ধীরে। কিন্তু আমি আপনার এ প্রস্তাবে রাজি হইতে পারি না। আমি কেমন করিয়া আপনার যাহা কিছু আছে, তাহাতে খোকা আর সরোজিনীকে বঞ্চিত করিব?

প্রিয়। যিনি তোমায় লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি অসময়ে এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের আরো যে সকল উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ সকলগুলি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, আমার দ্বারা তাঁহার একটি ও উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, তবে আমার জীবন আমি সার্থক মনে করিব।

ধীরেন্দ্র অনেক বুঝাইল, কিন্তু প্রিয়ম্বদা সকল কথাই কাটাইয়া দিল। অবশেষে একজন পরিচারিকারদ্বারা শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল, যে ধীরেন্দ্রের কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে যাহা ব্যয় হইবে সমস্তই তিনি নিজে দিবেন। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া ধীরেন্দ্রকে এখনই কলিকাতায় পাঠান হউক। শ্বশুর বৌমার এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া নানারূপ ভৎসনা করিয়া পাঠাইলেন, এবং যে পরিচারিকা এই কথা বলিতে গিয়াছিল, তাহাকেও যথোচিত ভৎসনা করিতে ক্রটি করিলেন না। পরিচারিকার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া প্রথমে প্রিয়ম্বদার স্থির হৃদয় কিছু চঞ্চল হইল, কিন্তু এই সময় স্বামীর শেষ আজ্ঞার কোন কথা প্রিয়ম্বদার মনে পড়িল। প্রিয়ম্বদার তখন মনে হইল যে মৃত্যু শয্যায় উপেন্দ্র তাহাকে তাঁহার পিতা মাতার অবাধ্য হইতে নিষেধ করিয়াছিল। সে আজ্ঞার কি মোহিনীশক্তি তাহা আমরা জানি না, কিন্তু প্রিয়ম্বদা স্থির হৃদয়কে আর চঞ্চল হইতে

দিল না। প্রিয়ম্বদার ইহাতে কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কষ্ট অন্য কেহ জানিল না, সে মনের কষ্ট মনেতেই চাপা রহিল। সুতরাং ধীরেন্দ্রকে গৃহেতে থাকিতেই হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর ধীরেন্দ্র গৃহে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিবার মনস্থ করিল, কিন্তু ধীরেন্দ্র গৃহে থাকায় অনেকের মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল। তাহার আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব সকলেই মনে করিল যে রমাগোপাল ধীরেন্দ্রের লেখা পড়া শেখা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাল করিতেছেন না, ধীরেন্দ্রের যেরূপ লেখা পড়ায় যত্ন ও আগ্রহ আছে, তাহাতে উৎসাহ পাইলে ধীরেন্দ্র বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত। আর এক কথা ধীরেন্দ্রের পিতাই উপায়ক্ষম ছিলেন, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থেই জমীদারি খরিদ করা হয়, সেই সকল জমীদারির আয়ও যথেষ্ট আছে, সুতরাং ব্যয় অধিক হইবে বলিয়া ধীরেন্দ্রের লেখা পড়া বন্ধ করাতে সকলেই কিছু বিস্মিত হইল। এই কথা লইয়া গ্রামে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল, কেহ বলিল রামগোপাল বড় কৃপণ, সেইজন্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে কলিকাতায় যাইতে দিতেছেন না, কেহ বলিল রামগোপাল বড় সহজ লোক নহেন, ধীরেন্দ্র ভালরূপ লেখাপড়া শিখিলে পাছে আপনার বিষয় ভাগ করিয়া বুঝিয়া লয়, সেই ভয়ে তাহার পড়াশুনা বন্দ করা হইল। কেহ বলিল হয়ত বা এখনি ধীরেন্দ্রকে সমস্ত বিষয়ে বঞ্চিত করা হইবে। এইরূপ গ্রামের অনেকে অনেক কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

রমানাথ মুখোপাধ্যায় নামে একজন প্রতিবাসী একদিন বৈকালে ধীরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইল, রমানাথ বাবুর সহিত ধীরেন্দ্রের পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, সেই কারণ ধীরেন্দ্রের তিনি বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহারই বৈঠকখানায় সেইদিন আরো ৬।৭ জন গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া ধীরেন্দ্রের বিষয় আন্দোলন হইতে ছিল, রমানাথ বাবু বড় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি সকল কথা বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য ধীরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধীরেন্দ্র আসিলে পর তাঁহার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল—

রমা। ধীরেন্, তুমি না এই বৎসর এল্ এ পরীক্ষা দিবে?

ধীরে। আজ্ঞে—সেইরূপ ইচ্ছা ছিল বটে কিন্তু অদৃষ্টক্রমে হইল না।

রমা। অদৃষ্টক্রমে হইল না কি রকম?

ধীরে। জ্যেঠা মহাশয়ের মত হয় না।

রমা। কেন তাঁহার আপত্তি কিসের?

ধীরে। কলিকায় থাকিয়া কলেজে পড়িতে ব্যয় অধিক হয়, সেই জন্য তিনি আমায় পড়াশুনা বন্ধ করিতে বলিয়াছেন।

রমা। এতদিন সে ব্যয় হইতেছিল কোথা হইতে?

এ কথার উত্তর ধীরেন্দ্র শীঘ্র দিতে পারিল না, কারণ তখন এই প্রশ্নে তাহার স্মৃতি সাগর আলোড়িত করিয়া শোকের তরঙ্গ উঠিতে ছিল, তাহাতে ধীরেন্দ্রকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। বহুকষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে ধীরেন্দ্র বলিল—

"ছোট দাদা, আমার সমস্ত ব্যয় দিতেন, আজ তিনি থাকিলে কি আমার কোন ভাবনা থাকিত।"

রমা। জানি উপেন্দ্র তোমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, কিন্তু তোমার ব্যয় অন্য কাহাকে দিতে হইবে কেন? তোমার পিতা তোমার জন্য যথেষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তোমার মতন একশত জনের কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। শুন ধীরেন্, আমার অজানিত কিছুই নাই, তুমি কি জান না তোমার পিতারই উপার্জ্জনে এই বিষয় হইয়াছে, আর সেই পিতার তুমি এক মাত্র পুত্র হইয়া অর্থের অভাবের জন্য কলেজ ছাড়িয়া দিবে?

ধীরে। আপনারা এই সকল কথা বলিতে পারেন, কিন্তু আমি জ্যেঠা মহাশয়ের বিপক্ষে কোন কথা বলিতে পারি না।

রমা। এখন যেন কোন কথা বলিলে না, কিন্তু পরে তোমায় নিশ্চয় ঠকিতে হইবে, রামগোপাল দাদার মৎলব আমার ভাল বোধ হইতেছে না।

এই সময় হরকালি ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর থাকিতে না পারিয়া এই সকল কথায় যোগ দিলেন। ইনি গ্রামের অনেকেরই বয়সে জ্যেষ্ঠ, গ্রাম সম্পর্কে ধীরেন্দ্রের ঠাকুরদাদা হন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—

"ভাইরে, এ কলিকালি, ভাল মানুষ হইলে একালে চলে না, ভালমানু-

সের নাম একালে আহাম্মক্। যাহা কিছু জমীদারি তোমার জ্যেঠা মহাশয় ভোগ করিতেছেন, হিসাবমত তোমারই সব ; তবে বাবাজি আমার বড় চালাক, সমস্তই আপনার নামে করিয়াছেন, সুতরাং অর্দ্ধেক অংশ পাইতে পারেন। আর অর্দ্ধেক বিষয় পাইলে তোমারই বা ভাবনা কি ? তুমি এই বেলা আপনার বিষয় পাকা করিয়া লও।"

ধীরে। জ্যেঠা মহাশয়ের যখন ইচ্ছা হইবে, তখন তিনি আমার বিষয় আমায় বুঝাইয়া দিবেন।

রমা। আর তাঁহার ইচ্ছা যদি কোন কালেই না হয়।

ধীরে। তবে আমিও সে বিষয়ের অভিলাষী নই, কারণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে আমি কোন কাজই করিতে পারিব না।

রমানাথ বাবু তখন কিছু অসন্তোষ হইয়া বলিলেন—

"তোমার কথাগুলি কিছু উন্নত মনের কথা বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি আজ যদি তোমার জ্যেঠা মহাশয় তোমায় বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন, কাল তুমি দাঁড়াইবে কোথায় আর পরিবার প্রতিপালন করিবেই বা কিরূপে ? তুমি নিশ্চয় জানিও আমাদের মনে কোনরূপ কুঅভিপ্রায় নাই।

ধীরে। আপনারা আমার যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহা আমি জানি ; আমাকে ভাল বাসেন বলিয়া আমার যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয় সেই জন্যই আমাকেই এই সকল কথা বলিতেছেন তাহাও আমি জানি। কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে, আমি সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সহ্য করিব, কিন্তু তাহা বলিয়া গুরুজনের অবাধ্য হইয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিব না।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এ কথায় বড় রাগ হইল, তিনি কিছু রাগান্বিত স্বরেই রমানাথ বাবুকে বলিলেন—

"আরে, ও রমানাথ, আর মিছে বকিয়া কি হইবে ? ও ছোক্‌রাকে কে বুদ্ধিমান বলে ? নিজে যদি আপনার ভাল না বুঝে, কা'র সাধ্য তা'কে বুঝাতে পারে ? ভায়া, তোমার যেরূপ বুদ্ধি দেখ্‌ছি—তা'তে তোমার লেখাপড়া আর না শিখ্‌লেও চলে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাস্তবিকই রাগিয়াছিলেন, তিনি ধীরেন্দ্রকে আরো কিছু

খুব ভৎর্সনা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রমানাথ বাবু তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়া ধীরেন্দ্রকে বলিলেন—"দেখ ধীরেন, তুমি বালক, সংসারে কিরূপ ভাবে চলিতে হয়, আজও তোমার সে জ্ঞান হয় নাই, বাস্তবিক সংসার ঘাড়ে না পড়িলে লোকে সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। আমি তোমার গুরুজনের প্রতি ভক্তি দেখিয়া সন্তোষই হইয়াছি, কিন্তু তত্রাচ তোমার জ্যেঠা মহাশয় যদি তোমায় সমস্ত বিষয়ে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তবে আমি কখনই তোমায় নিশ্চিন্ত থাকিতে বলি না, এবং তখন এইরূপ উদার প্রকৃতির পরিচয় তুমিও দিও না। অর্থ অনায়াসেই উপার্জ্জন হয় বটে, কিন্তু বিষয় অনেক কষ্টে হইয়া থাকে, যে সন্তান পিতার বিষয় বজায় রাখিতে পারে, সেই পুত্রই যথার্থ সুসন্তান। এখন তোমায় অধিক আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, তুমি এই বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

অগত্যা ধীরেন্দ্র তাহাই স্বীকার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন সেই সভামণ্ডলীর মধ্যে ধীরেন্দ্রের চরিত্র সমালোচনা আরম্ভ হইল। ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন—"আরে, ছোঁড়াটা নেহাত বেল্লিক।"

সিদ্ধেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বলিলেন—"এমন বোকাতো কোথায় দেখি না ছেলেটি নিরেট বোকা।"

মহেশ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"কিছু বলা যায় না ভাই, হয়ত পেটে পেটে বদমায়েসী থাকিতে পারে, সকল কথা এত লোকের সাক্ষাতে বলিবেই বা কেন?"

তখন গুণীরাম খুড়ো বলিলেন—"তোমরা লোকের কেবল অনিষ্ট করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছ, রামগোপাল কিছু মন্দ লোক নয়, সে যে ভাইপোকে সমস্ত বিষয় ফাঁকি দিবে, এ কথা কিছু বলেন নাই। রাম না হইতেই রামায়ণ গাইতে বসিয়াছ যে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন গুণীরামের মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"কি খুড়ো, তোমার 'আত রক্ষা' করিয়াছে বলে তাহার সাফাই গাইতেছ না কি?"

এই 'আত রক্ষা' কথাটির ভিতর কি একটা ভয়ানক গুপ্ত কথা ছিল, কারণ

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সকলে একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। গুণীরাম খুড়ো কিছু অপ্রতিভ হইয়া বিষণ্ণ মনে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় সকলেরই প্রতি একটা মর্ম্মান্তিক আতক্রোধ হইয়া ছিল। কিন্তু সে বিষয় যতদূর পারিলেন গোপন করিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে তখন আবার এই গুণীরাম খুড়ার চরিত্র সমালোচনা আরম্ভ করিল: এই গুরুতর কার্য্যে ৫।৭ ছিলিম তামাকু পোড়াইয়া গৃহে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গুণীরাম।

এই স্থলে গুণীরাম খুড়োর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। গুণীরামের গুণ অনেক, লোকের সহিত বিবাদ বাধাইতে সত্যকে মিথ্যা করিতে মামলা, মকর্দ্দমা, জাল জালিয়াৎ প্রভৃতি করিতে গুণীরাম একজন অদ্বিতীয়; কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি কোন্ গুণে যে খুড়ো উপাধি পাইয়াছেন আমরা অনেক অনুসন্ধানেও তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেন যে তাহাকে গ্রামের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই 'খুড়ো' বলিয়া ডাকিত তাহা এপর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অনেক পল্লীগ্রামে এইরূপ এক একজন 'সরকারী খুড়ো' আছেন, ভরসা করি পাঠকপাঠিকাগণ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। গুণীরামের পিতা একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, একে কুলীন ব্রাহ্মণ তাহার উপর অদৃষ্ট ক্রমে তাঁহার পাঁচ সাতটী কন্যা জন্মিয়াছিল, সুতরাং কন্যার বিবাহ লইয়া তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা ও অত্যন্ত মন্দ ছিল, সুতরাং তিনি প্রথম কন্যাটিকে অঘরে দান করেন, ক্রমে কন্যা বিক্রয় পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন; ৪।৫টী কন্যা বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জনও তাঁহার হইয়াছিল। পরে গুণীরামের পিতার মৃত্যু হইল, মাতার মৃত্যু তাহার অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছিল, ভগ্নীগণ সকলেই শ্বশুরালয়ে থাকিত, সুতরাং এখন হইতে গুণীরামের সংসারের মধ্যে তিনি স্বয়ং ব্যতিত আর কেহই নাই।

গুণীরাম তখন বড় বিপদে পড়িল, একা সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম করিতে হয়, প্রত্যহ হাত না পোড়াইলে আর আহার হয় না। প্রথমে গুণীরাম ভাবিল দূর হউক সংসারে থাকিয়া আর আমার কি হইবে?—সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া যাই। কিন্তু এই সময় তাহার জন কয়েক ইয়ার জুটিল, তাহাদের কুসংসর্গে গুণীরাম গাঁজা, গুলি, মদ ইত্যাদিতে বিলক্ষণ আসক্ত হইল, সুতরাং আর তাহার সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া হইল না; এই সময় হইতেই তিনি "খুড়ো" উপাধী পাইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী হওয়া হইল না বটে, কিন্তু গুণীরামের পিতৃসঞ্চিত অর্থসকল ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া আসিল, ক্রমে গুণীরামের ডানহস্তের ব্যাপারের প্রতিও ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, এই সময় হইতে নেশার পয়সার দরুণ গুণীরামকে উপায়ের চেষ্টা করিতে হইল। কিন্তু তাহার লেখা পড়া তেমন কিছুই জানা ছিল না, সুতরাং উপার্জ্জন কিরূপে হইবে? অভাব হইলে যে কোন উপায়ে হউক সেই অভাব পূরণ করাই মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ—গুণীরাম উপায়ন্তর না দেখিয়া নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মের দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে তাহার অন্যান্য অভাব একপ্রকার দূর হইল বটে, কিন্তু এখন আবার এক গুরুতর অভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, গুণীরামের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, সংসারে ও অন্য কেহ ছিল না, সুতরাং এই গৃহিণীর অভাব তাহার পক্ষে বড় গুরুতর ও ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইল। গুণীরামের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল, কারণ একে পিতা কন্যা বিক্রয় করিয়া কুলে কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আবার এখন গুণীরামের অবস্থা ও ভাল নয়, আর বিশেষত তাহার অসাধারণ গুণের কথাও কাহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং গুণীরামের বিবাহ দেওয়া বড় সহজ কথা নহে।

গুণীরাম কিন্তু ভাবিত কেন এমন হইল, আমার সমবয়স্ক সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে কোন্ পাপে বিধাতা আমার অদৃষ্টে বিবাহের কথা লিখিলেন না! গুণীরামের আরো বিশেষ কষ্ট এই যে গ্রামের কুলবধূরা তাহাকে দেখিলে একহাত ঘোমটা দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যায়, কুলকন্যারা তাহাকে দেখিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালায়, সুতরাং সুন্দরী-মুখদর্শনজনিতসুখভোগ আর গুণীরামের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। গুণী-

রামের এই সকল কারণে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের উপর বড়ই জাতক্রোধ হইল. মনের দুঃখের কথা আর কাহাকে বলিবে? রাত্রে গোপনে নীচবংশীয়া যুবতী রমণীগণের সহিত সাক্ষাত করিয়া এই সকল দুঃখকাহিনী তাহাদিগকে জানাইয়া মনের ব্যথা দূর করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সে কার্য্যে ও অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে হড়কো ও লাঠির আঘাত খাইয়া তাহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং গুণীরাম এখন আবার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইল। এই সময় গুণীরামের বয়স প্রায় চাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল, এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়ায় এবং বিবাহের জন্য বিশেষ লালায়িত হওয়ায় অচিরাৎ গুণীরাম গ্রামের মধ্যে একজন 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' হইয়া দাঁড়াইলেন। কেহ যদি বিদ্রূপ করিয়া বলিত—"খুড়ো, তুমি শাশুড়ে হইবে কবে গো"—গুণীরাম খুড়োর মুখে তখন আর হাসি ধরিত না, খুড়ো তখন হাসিতে হাসিতে বলিতেন—"বাবা, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, আমার এমন শুভদিন কি হইবে?" গ্রামের অনেক দুষ্ট ছেলে তাহাকে লইয়া অনেক সময় রঙ্গ ও করিত। ক্রমে গুণীরাম বিবাহের জন্য উন্মত্ত হইবার উপক্রম হইল, তখন তাহার এক ভগ্নীপতি বহুকষ্টে তাহার এক সম্বন্ধ স্থির করিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে সে বিবাহ হইয়া গেল, বধুর চাঁদপানা মুখ ও তাহাকে যৌবনোন্মুখ দেখিয়া গুণীরামের আনন্দসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল। ভগ্নীপতির অবস্থা ভাল ছিল, তিনি এই বিবাহের মধ্যস্থ বলিয়া পাকস্পর্শে কিছু ধুমধামের আয়োজন করিলেন। আয়োজনও যথেষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণই নিমন্ত্রণ আসিল না, কারণ একটা জনরব উঠিল যে গুণীরাম খুড়ো এক বেশ্যার কন্যা বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। যাহা রটে তাহা ঘটে, বাস্তবিকই গুণীরামের ভগ্নীপতি এক বেশ্যাকন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। গুণীরাম দেখিল তাহার বড় বিপদ, বিবাহ করিয়া তাহাকে একঘরে হইতে হইতেছে, অতঃপর তাহাকেও আর কেহ নিমন্ত্রণ করিবে না; সুতরাং মাসের অর্দ্ধেক দিনের ও অধিককাল যে সুখ উপভোগ হইত এই ঘটনায় তাহাকে সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া গুণীরাম রামগোপাল ঠাকুর শরণাগত হইয়া পড়িল, তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক

প্রকার অনুনয় করিয়া বলিল—'চাটুর্য্যে মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে,আমার হরিষে বিষাদ যেন না হয়,আমার বাড়া ভাতে ছাই যেন না পড়ে। আপনি রক্ষা না করিলে আমি আপনার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিব।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মহত্যা হয় দেখিয়া রামগোপালের বড় দয়া হইল, তিনি তাহাকে অভয় দান করিলেন, সমাজে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তিও ছিল। তিনি বলিলেন যে সে কন্যা বেশ্যাকন্যা নয়, সকলকেই নিমন্ত্রণ যাইতে হইবে, তখন আর কেহ আপত্তি করিতে পারিল না, সকলকেই যাইতে হইল, গুণীরামের ও জাতি রক্ষা হইয়া গেল। কিন্তু এই বেশ্যাকন্যাবিবাহ-ঘটনা অনেকেরই মনে সত্য বলিয়া বিশ্বাস রহিয়া গেল। অনেকে তাহার জন্য পরে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের হর-কালি ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই জন্য আজ সুযোগ পাইয়া গুণীরাম খুড়োর উপর একহাত লইলেন, সেই কারণেই জাত রক্ষা কথাটী উত্থাপন করিলেন। কিন্তু পাছে এ কথার কোনরূপ জবাব দিতে গেলে পুনরায় এই কথা লইয়া কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই জন্য গুণীরাম ঐরূপ বিদ্রূপে ও কোন কথা বলিলেন না, পরে অন্য উপায়ে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার মনস্থ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশোধ।

প্রতিশোধ লইবার মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু কাহার উপর প্রতিশোধ লইতে হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি এইরূপ মীমাংসা করিতে করিতে চলিলেন। প্রথম অপরাধী হরকালি ভট্টাচার্য্য কারণ তিনিই আজ এই 'জাত রক্ষা' কথাটী তুলিয়াছেন। দ্বিতীয় অপরাধী

রমানাথ কারণ তাঁহারই বাড়িতে আজ এই অপমানটী হইল ; গুণীরাম এরূপ ও ভাবিল যে তাহাকেই অপমান করিবার জন্য আজিকার এই কমিটী বসিয়াছিল, ধীরেন্দ্রের কথা উপলক্ষ মাত্র। তৃতীয় অপরাধী ধীরে ছোঁড়া কারণ তাহার কথা লইয়াইত আজ এই কথা উঠিল। চতুর্থ অপরাধী সিদ্ধেশ্বর,মহেশ প্রভৃতি কারণ তাহারা হরকালির টীট্‌কারীতে উচ্চহাস্য করিয়াছে। এখন অপরাধী স্থির হইল, কিন্তু ধীরেন্দ্রের অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া গুণীরামের বোধ হইল, কারণ ইহাদের মধ্যে সে দুর্ব্বল বালক মাত্র, মনে করিলেই প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে, সুতরাং তাহার প্রতিশোধ সর্ব্বাগ্রে লইবার জন্য গুণীরাম কিছু ব্যগ্র হইল।

এই সময় হঠাৎ তাঁহার কি কথা মনে হইল, গুণীরাম যে পথ ধরিয়া গৃহে যাইতেছিলেন, সে পথে আর অগ্রসর হইলেন না, কিছু দূর ফিরিয়া আসিয়া অন্য একপথ ধরিয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, দুই একটি করিয়া অসংখ্যক তারা আকাশে উঠিয়াছিল, তখন চন্দ্রমা না থাকিলেও তাহাতেই আকাশের একরূপ সুন্দর শোভা হইয়াছিল, কিন্তু একখানা মেঘ তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেছিল, সেই আকাশ সরোবরের প্রস্ফুটিত স্বর্ণ কমলের উপর মদমত্ত হস্তির ন্যায় মেঘখানা যেন ছুটোছুটী করিয়া দৌড়িয়া বেড়াইতেছিল। সেইজন্য আজিকার কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর চন্দ্রঠাকুর গোপনে থাকিয়া এই সকল স্বর্ণকমল গুলির পীড়ন দেখিয়াই দুঃখানুভব করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার দেখা আজ অনেক বিলম্বে পাওয়া যাইবে। ক্রমে মেঘ খানা বড়ই ছুটাছুটী আরম্ভ করিল, কোথা হইতে আরো অনেকতক নূতন মেঘ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাকাশে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ দেখা দিল। পরক্ষণেই শীতল বাতাসের সহিত ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন গুণীরাম উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বৃষ্টির জলে তাহার সমস্ত শরীর ভিজিয়া গেল। আর্দ্র বস্ত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গুণীরাম রামগোপালের বাড়িতে প্রবেশ করিল।

রামগোপাল তখন সায়ং সন্ধ্যা শেষ করিয়া জলযোগের জন্য অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, গুণীরামকে এরূপ অবস্থায় আসিতে দেখিয়া বলিলেন—"কি হে, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কি মনে করিয়া আসিয়াছ।"

গুণী। আর বাবা, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আর এই বৃষ্টিতে ভিজিতে পারিব না।

রাম। কোন কথা আছে নাকি?

গুণী। কথা বিলক্ষণই আছে—বড় বিপদ।

রাম। বিপদ কাহার?

গুণী। বিপদ তোমার—তোমার হইলেই সে বিপদ আমারও হইল। সেই জন্য এই সন্ধ্যাকালে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এত দৌড়াদৌড়ি আসিয়াছি।

রাম। আমার আবার বিপদ কিসে! ব্যাপার খানা কি বল দেখি?

গুণী। ব্যাপার বড় সহজ নহে, তোমার ভাইপো ছোঁড়াটা তোমার সমস্ত বিষয় তাহার পিতার স্বোপার্জ্জিত বলিয়া তোমার নামে নালিশ করিবে, আজ এই বিষয় রমানাথের বড়িতে কমিটী হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে, ইহার ভিতর রমানাথ, হরকালি ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধেশ্বর, মহেশ প্রভৃতি সকলেই আছে তাহারা সকলেই তোমার বিপক্ষ, বিশেষ হরকালি ভট্টাচার্য্য তোমার যেরূপ কটূক্তি করিয়াছে তাহা মুখে আনা যায় না; আমি দৌড়িয়া আসিয়াছি এখন আমার সে সকল কথা মনে অসিতেছে না, পরে আমার মুখে সমস্তই শুনিতে পাইবে।

গুণীরাম খুড়োর কথা শুনিয়া রামগোপাল বিশেষ ভীত ও হইল, কারণ মনে পাপ থাকিলে সামান্য কারণেই ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভাব কাহাকে জানিতে দিলেন না। গুণীরাম খুড়োকে গোপনে লইয়া গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া কি পরামর্শ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

গুণীরামকে বিদায় দিয়া তিনি ধীরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধীরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল—

রামগোপাল। তুমি আজ বৈকালে রমানাথ বাঁড়ুর্য্যের বাড়িতে গিয়াছিলে?

ধীরেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

রাম। কেন গিয়াছিলে?

ধীরে। তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া।

রমা। আমার নিকট সকল কথা সত্য বলিবে?

ধীরে। আমার মুখে কি কখন মিথ্যা কথা শুনিয়াছেন?

রমা। আচ্ছা, সেখানে আমাদের বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল।

ধীরে। আজ্ঞে হইয়াছিল।

রমা। আচ্ছা, যাও, আর বলিতে হইবে না, আমি সে সমস্ত কথাই শুনিয়াছি।

ধীরেন্দ্র চলিয়া গেলে রামগোপাল ভাবিল, গুণীরামের কথার উপর যে একটু অবিশ্বাস ছিল, এখন ধীরেন্দ্রের নিজের মুখে শুনিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কি আস্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখেই এই সর্ব্বনেশে কথা বলিতে সাহস করিল! যাহা হউক, শীঘ্রই ইহার একটা উপায় করিতে হইতেছে। আর নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে না।

ধীরেন্দ্র ফিরিয়া যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে ছিল, যখন জ্যেঠা মহাশয় সমস্ত কথাই শুনিয়াছেন, তখন আমার যে তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি আছে, তাহার বিশেষ পরিচয় ও পাইয়াছেন, সুতরাং আমার উপর যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পিত্রালয়ে।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার ২।৪ দিবস পরে, প্রিয়ম্বদার পিতা বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উমীপুরে আসিলেন। ধীরেন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জামাতার শোক বড়ই লাগিয়াছিল, এখন সে শোকের কিছু উপশম হইলে কন্যাকে একবার এই সময়ে নিজগৃহে লইয়া যাইবার মানসে আজ আসিয়াছেন। অন্য সময় আসিলে ব্রাহ্মণ একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে যাইতেন, সেখানে গিয়া কন্যাকে কুশল প্রশ্ন করিয়া দৌহিত্র দৌহিত্রীর মুখচুম্বন করিয়া বড়ই আমোদ আহ্লাদ করিতেন। কিন্তু আজ আর ব্রাহ্মণের অন্তঃ-

পুরে যাইবার সেরূপ আগ্রহ নাই, তিনি আজ সদর বাড়ির রকের উপর বিরাসনেই বসিয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণের মুখ আজ বিষণ্ণ, অবনত মস্তকে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া উত্তরীয় দ্বারা চক্ষের জল মুছিতেছেন। রামগোপাল তাড়াতাড়ি আসিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বৈবাহিকের হাত ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইলেন। ধীরেন্দ্র সরোজিনী আর খোকাকে আনিয়া তাঁহার কোলে দিয়া গেল।

"দাদা মশাই তুই কাঁদিস কেন" বলিয়া সরোজিনী গলা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু যাহার মধুর আধ আধ কথা শুনিলে বিশ্বনাথ আনন্দে গলিয়া যাইতেন, আজ তাহার সেই মধুময় কথাতেও তাঁহার চক্ষের জল নিবারণ হইল না, বরং বৃদ্ধি পাইল। বালিকার ইহাতে বড়ই মনক্ষুণ্ণ হইল, সকলের মুখের দিকে দুই চারিবার চাহিয়া বালিকা বিষণ্ণ মনে তথা হইতে চলিয়া গেল।

রামগোপাল বৈবাহিককে কিছু সান্ত্বনা করিয়া অন্তঃপুরে বৌমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লইয়া চলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন্দ্রও চলিল। প্রিয়ম্বদা পিতার আগমনের কথা জানিতেন না, কারণ পূর্ব্বের ন্যায় এবার দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে কেহ সে সংবাদ দেয় নাই। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে "বাবা গো কি করে তোমায় এ পোড়ার মুখ দেখাইবো গো" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে যেমন গৃহমধ্যে চলিয়া যাইবে অমনি চৌকাটের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। ধীরেন্দ্র নিকটেই ছিল, মূর্চ্ছিতা প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া ফেলিল। ধীরেন্দ্র সে সময় না ধরিলে প্রিয়ম্বদার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিত। বিশ্বনাথ কন্যার সেই হৃদয় বিদারক, "বাবা গো, কি করে তোমায় এই পোড়ার মুখ দেখাইবো গো" কথা কয়েকটি শুনিয়া এবং তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনিও স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্র বহু কষ্টে প্রিয়ম্বদার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল।

গৃহিণী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, বৌমা ও বৈবাহিকের কান্না শুনিয়া তিনিও "বাবারে; একবার আয়রে, আজ তো'র শ্বশুর আসিয়াছেরে" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে সেইখানেই আছাড় খাইয়া পড়িলেন। চপলা রন্ধনশালা হইতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মেজ দিদির শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

শশিকলাও এই সময় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। মনে মনে কিছু বিরক্ত হইলেও ঠাকুরুণকে সান্ত্বনা করিতে বলিল। এই সময় সরোজিনী ও খোকা কাঁদিতে ছিল, ধীরেন্দ্র ও মহেন্দ্র আসিয়া কোলে করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে সকলেই কিছু স্থির হইল, তখন রামগোপাল বৈবাহিককে লইয়া পুনরায় বাহিরে আসিলেন। সেখানে আসিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন—

"বৈবাহিক মহাশয়, আমার কন্যাটিকে কাল প্রত্যূষে লইয়া যাইবার মানস করিয়াছি, এসময় তাহাকে একবার স্থানান্তর করা ও উচিত।

রাম। তাহাতে আর আমার আপত্তি কি? তবে বৌমার মত হইলেই হইল।

বিশ্ব। পিত্রালয়ে যাইতে কি কন্যার অমত হইতে পারে?—বিশেষত এরূপ অবস্থায়।

রাম। বৌমা যেখানে থাকিয়া সন্তোষ হন, সেই খানেই থাকিতে পারেন, তবে কি জান ভাই, আমার ঘরে আরত ছেলে পিলে নাই, সরো আর খোকার জন্য কিছু কষ্ট হইবে, বিশেষত গৃহিণীরত তাহাদের অন্ত প্রাণ।

বিশ্ব। তাহা হইতেই পারে। আমারও আর সংসারে কে আছে বল। মনে করিয়াছিলাম আমার যেমন পুত্র নাই, উপেন্দ্রই আমার পুত্রের কাজ করিবে। বাস্তবিক আমি তাহাকে পুত্রের ন্যায়ই দেখিতাম; বিধাতা আমায় এই বৃদ্ধ বয়সে বড় শোকই দিয়াছেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রামগোপাল বলিলেন—"ভাই, আমাদের সকলেরই অদৃষ্ট মন্দ; আর না জানি পূর্ব্বজন্মে কত পাপই করিয়াছিলাম, সেই পাপে আমাদের এই শোক পাইতে হইল।"

এইরূপ নানা কথায় সেদিন শেষ হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষেই প্রিয়ম্বদার পিত্রালয়ে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল। গ্রামস্থ সকলে যাহারা এই সংবাদ পাইয়াছিল, তাহারা প্রাতে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিতে আসিল, প্রিয়ম্বদার পিত্রালয় গমনে সকলেই আজ বিষণ্ণ, কিন্তু ধীরেন্দ্র আর চপলার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট অধিক হইয়া ছিল। চপলা গত রাত্রে একবার চক্ষু মুদিত করে নাই, প্রিয়ম্বদার গলা ধরিয়া সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়া ছিল। প্রিয়ম্বদা তাহাকে অনেক প্রকার

বুঝাইয়াও সান্ত্বনা করিতে পারে নাই। ধীরেন্দ্র সরোজিনী আর খোকাকে লইয়া গত কল্য কাটাইয়াছে। মনের কষ্ট কাহাকেই জানিতে দেয় নাই।

প্রিয়ম্বদা অতি প্রত্যূষেই একে একে সকলেরই নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। প্রথমে গৃহিনীর নিকট বিদায় লইলেন, তাঁহার পা ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন। "মা, আমায় ভুলিও না, যখন ইচ্ছা হইবে একজন লোক পাঠাইয়া দিলেই আমি আসিব।" এই কথা বলিয়া প্রিয়ম্বদা ঠাকুরাণীর চরণ ধূলি লইলেন, গৃহিণী ও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বধুর মুখ চুম্বন করিলেন। তাহার পর প্রিয়ম্বদা শশিকলার নিকট বিদায় লইতে গেল, তাহাকে ও বলিলেন—"দিদি আমায় ভুলিও না, যেখানেই থাকি আমরা তোমাদেরই। যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, যদি কখন কোন কথা বলিয়া থাকি ছোট ভগ্নী জ্ঞান করিয়া সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিও।"

শশি। তুমি কবে আমায় কি বলিয়াছ, আমি কি তাই মনে করিয়া বসিয়া আছি।

প্রিয়। দিদি তবে আমি চলিলাম, তোমার পায়ের ধুলা দাও, আমার সরো আর খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিও, যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহারা তোমাদেরই।

এই বলিয়া প্রিয়ম্বদা প্রণাম করিয়া শশিকলার পায়ের ধুলা লইল। তখন শশিকলা বলিল—"একান্তই যাইবে, তবে যাও, কিন্তু তোমার—আমার এক্লার গলায় সংসার ফেলিয়া দিয়া যাওয়া ভাল হয় না; ঠাকুরুণ এখন সেরূপ সংসারের কাজ কর্ম্ম আর দেখিতে পারেন না। তুমিও চলিলে তবে আমি একলা কত করিব?"

"ছোট বউ তোমার সাহায্য করিবে" বলিয়া প্রিয়ম্বদা অন্যত্র বিদায় লইতে গেল। তখন শশিকলা এই ছোট বউয়ের কথায় নাক্ শিট্কাইয়া বলিল—"সে আবার সাহায্য কি? পেটে খেতে হইলেই করিতে হয়। মেজ বউয়ের ঐরূপ এক একটা কথায় আমার হাড়মাস জ্বালা করে।" তাহার পর নিকটস্থ একজন চাক্‌রাণীকে ডাকিয়া বলিল—"বলি ও শ্যামা, এই মেজ বউয়ের অমন দশা যে হলো, বাপের বাড়ি থেকে একটা তত্ত্বও দেখিতে পেলেম না; নিজে যে এলো তা নাতী, নাত্নীর জন্য একটা খইয়ের মো ও

আনে নাই, এই বাপের আদর? মেজ বউয়ের অমর বাপের বাড়ি যেতে লজ্জাও করে না! ছি! ধিক্!"

শ্যামা চাকরাণীর এই সকল কথা বড় অসহ্য হইল, সে থাকিতে না পারিয়া বলিল—"হাঁগা বড় মা, মেজ মার বাপেদের কি এখন তত্ব কর্‌বার সময়, তুমি বাপু না বুঝে সুঝে বড় কাঁট্ কাঁট্ করে বলো।"

শশিকলা শ্যামাচাকরাণীর মুখে এরূপ অপমানসূচক কথা শুনিয়া রাগে একবারে জ্বলিয়া উঠিল। "পোড়ার মুখী, ভাল খাকী, তো'র এত বড় আস্পর্দ্ধা, ঝাঁটা মেরে এখনি দূর করে দিব" প্রভৃতি সম্বোধন করিতে করিতে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া প্রহার করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইল। শ্যামা গতিক ভাল নয় দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইল।

প্রিয়ম্বদা তাহার পর চপলার নিকট গেল, চপলা তখন সরোজিনীর বেশভূষা করিয়া দিতেছিল, আর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে এক একবার তাহার মুখচুম্বন করিতে ছিল। প্রিয়ম্বদাকে দেখিয়া চপলা ধীরে ধীরে তাহার চরণে প্রণাম করিল—মুখে কোন কথাই বলিতে পারিল না। প্রিয়ম্বদা চপলার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জন্মএয়োস্ত্রী হও, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর আশীর্ব্বাদ নাই।"

প্রিয়ম্বদা পরে একে একে অন্যান্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ছোট, বড়, ভদ্র, অভদ্র, সকলের নিকট গিয়া সকলেরই প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিল। সকলেই প্রিয়ম্বদার পিত্রালয়গমনজন্য বিশেষ দুঃখিত হইল। বেলা অধিক হয় দেখিয়া বিশ্বনাথ কন্যাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন, ধীরেন্দ্র সরোজিনী আর খোকাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিল।

সকলেই গাড়ির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, যতক্ষণ গাড়ি দেখা যাইতে লাগিল, কেহই সেস্থান হইতে নড়িল না। প্রতিবাসিনীদিগের ও চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ। এইবার ধীরেন্দ্রের চক্ষুতে ও জল দেখা গেল, এতক্ষণ তাহার চক্ষে কেহ জল দেখে নাই।

প্রিয়ম্বদা চলিয়া গেলে রামগোপাল মনে মনে ভাবিল, ভালই হইল, এই সুযোগে ধীরেন্দ্রকে যে কোনপ্রকারে হউক জব্দ করিতে হইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিদাতা ।

রামগোপাল এখন ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে ধীরেন্দ্রকে শাসন করা যাইতে পারে। দুই তিন দিবস আর রামগোপালের অন্য কোন কাজ মনে লাগিত না, নিয়মিত সময় স্নান আহার, পূজা আহ্নিক পর্য্যন্ত হইত না, রামগোপাল সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিত কিরূপে ধীরেন্দ্রকে শাসন করা যায়। ক্রমে কোন উপায় স্থির করিতে যতই তাঁহার বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই তাঁহার ধীরেন্দ্রের উপর ক্রোধের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পরে অনেক ভাবিয়া এই স্থির হইল, যে কোন উপায়ে হউক ধীরেন্দ্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ এ কাল সর্পকে আর গৃহে রাখিলে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইবে। রামগোপাল ইহাও জানিত অর্থ না থকিলে কেহই মকর্দ্দমা করিতে পারে না, ধীরেন্দ্রকে যদি রিক্তহস্তে বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত করি, তবে সে আপনার পেটের দায়েই অস্থির হইবে, মকর্দ্দমা করিবে কি রূপে? তবে এক কথা ধীরেন্দ্রের পরিবারের গাত্রে কতক গুলি অলঙ্কার আছে, যেরূপে হউক সে গুলি হস্তগত করিতে হইবে, তাহা না হইলে সে অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও মকর্দ্দমা করিতে পারে।

সেই দিন বৈকালে রামগোপাল অন্তঃপুরে গিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে কোথা হইতে এক বেনামী চিঠি আসিয়াছে, যে আমার বাড়িতে আগত শনিবার ডাকাত পড়িবে, ডাকাত পড়ুক আর না পড়ুক, পূর্ব্ব হইতে সাবধানে থাকা উচিত—অলঙ্কার, টাকা কড়ি এবং মূল্যবানীয় বস্ত্র সকল আমার নিকট লইয়া আইস। সকলেই যে যাহার অলঙ্কার, টাকাকড়ি, এবং মুল্যবানীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন্দ্রের যথাসর্ব্বস্ব রামগোপালের হস্তগত হইল। এখন রামগোপাল ভাবিল যে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছি, এখন কি উপায়ে ইহাকে তাড়াইয়া দিয়া নিষ্কণ্টক হইতে পারি। ধীরেন্দ্রকে ডাকিয়া স্পষ্ট করিয়া এ কথা বলিতে রামগোপাল প্রাণ থাকিতে পারিবে না। এই কথা দুই একবার রামগোপালের মনে হইয়া ছিল বটে, কিন্তু কি জানি ঐকথা মনে হইলেই

তাঁহার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিত, জিহ্বা যেন কে ভিতরদিকে টানিত, সুতরাং সে কথা মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিতে রামগোপালের সাহস হইত না।

রামগোপাল এইরূপ ভাবিতেছেন, ঐই সময় সুবুদ্ধিদাতা স্বয়ং গুণীরাম খুড়ো মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন। গুণীরামকে দেখিয়া রামগোপাল পূর্ব্বাপেক্ষা এবার কিছু সমাদর করিয়া বসাইলেন। গুণীরাম সে সমাদরের অর্থ বুঝিল, মনে মনে ভাবিল যে ঔষধ ধরিয়াছে, এখন এক খেলা খেলা যাইতে পারে। প্রথমে কেহই কোন কথা তুলিল না, কারণ কাহার সে কথা প্রস্তাব করিতে সাহস হইতেছিল না, উভয়ে উভয়েরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, এইরূপে অন্যান্য বাজে কথায় ২।৩ ছিলিম তামাকু পোড়াইয়া গুণীরাম রামগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল—"সে বিষয়ে কি স্থির করিলেন, আরো নূতন কথা আছে যে, আপনার কি নিশ্চিন্ত থাকা ভাল হয়?"

বিষয়টা যে কি তাহা রামগোপালকে বলিবার আবশ্যক ছিল না, আমরা সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে পারি যে, সে বিষয়ে তাহার পর নূতন কথা কিছুই হয় নাই, কিন্তু এরূপ ভাবে একটা কথা না বলিলে নাকি কার্য্যোদ্ধার হয় না, সেই জন্য গুণীরাম এই মিথ্যা কথা বলিল। গুণীরাম আসিবা মাত্র যদি রামগোপাল প্রথমেই ব্যস্ততার সহিত সেই বিষয়ের কথা ফেলিত, তাহা হইলে গুণীরাম এইরূপ মিথ্যা কথা বলিত না। রামগোপাল গুণীরামের এই কথায় প্রথমেই কিছু থতমত খাইলেন, পরে বলিলেন—"খুড়ো, আমি আর কি স্থির করিব, তোমাকেই সে সকল করিতে হইবে। তুমি যে আমার একজন হিতৈষী আমি তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। এখন নূতন কথা আবার কি?"

গুণী। রমানাথ আর হরকালী বড়ই লাগিয়াছে, সে দিন অমৃতবাবু বাড়ি আসিয়াছিলেন, তিনি এক জন হাইকোর্টের ভাল উকীল কি না সেই জন্য তাঁহার নিকট সকলে গিয়া এই বিষয়ে কি কমিটি করিয়াছিল, আমি তোমার পক্ষের বলিয়া আর সে কমিটীতে থাকিতে পাই নাই।

রাম। বল কি খুড়ো, এরা এতদূর করিতেছে?

গুণী। এরাত এতদূর করিতেছে, এখন তুমি কি স্থির করিয়াছ বল দেখি?

রাম। আমি ধীরেকে বাড়ি থেকে দূর করিয়া দিব স্থির করিয়াছি।

গুণী। বেশ, বেশ, উত্তম পরামর্শ করা হইয়াছে।

রাম। আর পাছে সে তাহার স্ত্রীর অলঙ্কার গুলি বিক্রয় ক'রে মকর্দ্দমার খরচ চালায়, সেই জন্য কৌশলে সে গুলি সমস্তই হস্তগত করিয়াছি।

রামগোপালের এই কথা শুনিয়া গুণীরাম আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"উত্তম,উত্তম, অতি উত্তম। বাবা,লক্ষ্মীর শ্রী থাকিলে বিষয় বুদ্ধি আপ্ না হইতে হয়, এ সকল কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। আচ্ছা, এখন ধীরে ত বাড়ি থেকে দূর হইল.হাতে এক পয়সা নাই,পেটের জ্বালাতেই মরিবে, মকর্দ্দমার খরচ আর কোথায় পাইবে? এখন তাহার—" বাকি কথাগুলি আর বলা হইল না, গুণীরাম এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হাসিয়া অস্থির হইল, হাসির তরঙ্গের উপর আবার নূতন তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তখন গুণীরামের সে অহ্লাদের সীমা করে কে? হাসির বেগ একটু থামিলে বলিল—"এখন তাহার স্ত্রী কোথায় থাকিবে?"

রাম। সেত আমার বাড়িতে দাসীর মতন আছে। সেইরূপ দাসীর মতনই থাকিবে।

গুণীরাম ঘাড়নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"উঁ হুঁ তাহা হইবে না, তাহাকেও বাড়ি থেকে দূর করিয়া দিতে হইবে।"

রাম। সে স্ত্রীলোক, বিশেষত তাহার বাপের বাড়িতে থাকিবার স্থান হইবে না, কিরূপে তাহাকে তাড়াইয়া দিব।

গুণী। অত মায়ার শরীর করিলে তুমি মকর্দ্দমা নিশ্চয় হারিবে, মকর্দ্দমা করিতে হইলে স্নেহ, মায়া, ভালবাসা শরীরে রাখিতে নাই। আর এই কথাটা বুঝিয়া দেখ না, যদি ধীরের স্ত্রী বাড়িতে থাকে তবে বাড়ি খানা তাহার দখলেই রহিল, আর তাহার স্ত্রী যখন তোমার সংসারেই রহিল, তখনত এক সংসারভুক্ত প্রমাণই হইবে। বাড়ি খানা দখলে থাকিলে অনায়াসে অর্দ্ধেক অংশ কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারিবে, তাহাতেও মকর্দ্দমার খরচ চলিতে পারে। এক সংসারভুক্ত প্রমাণ হইলে ত কথাই নাই, অর্দ্ধেক বিষয় নিশ্চয়ই তোমায় দিতে হইবে বাবা, সকল দিক ভাবিয়া কাজ করিতে হয়।

রাম। বটে, বটে, বটে, আমি বাপু এতদূর ভাবি নাই। আর আমিই বা ভাবিবার আবশ্যক কি, যখন স্বয়ং গুণীরাম খুড়ো আমার বুদ্ধিদাতা। আচ্ছা খুড়ো, তাড়াইয়া দিবার কথা ত মুখে বলা যায় না। ইহার একটা উপায় কি বল দেখি? হাজার হউক পিতৃ মাতৃ হীন, আমিই সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছি, আর ধীরে ছোঁড়া আমার সম্মুখে এদিকে বড়ই শিষ্ট, শান্ত। আমি কেমন করিয়া এ কথা স্পষ্ট তাহার মুখের উপর বলি বল দেখি।

গুণী। ইহার জন্য আর ভাবনা কি? তাহার উপায় আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি। হাতে না মেরে ভাতে মারা আছে জানত। সেইরূপ করিলেই হইল। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রকে আর বাড়ির মেয়েদের বলিয়া দিন যে, ধীরেনের সহিত বিনা কারণে কলহ বাধায়, নানা প্রকারে তাহার উপর অত্যাচার করে, দিনকতক এইরূপ করিলেই বিলক্ষণ কলহ বাধিয়া যাইবে। তখন তুমি কর্ত্তৃত্ব ফলাইয়া ধীরেনকে বলিবে যে, এই সকল কলহে আমি বড় বিরক্ত হইয়াছি, আমার পরিবারদিগের সহিত তোমার বনিবে না, তুমি আর এখানে না থাকিয়া উপায়ের চেষ্টা করগে। ধীরেন্দ্রকে বাড়ির বাহির করিতে পারিলে, এইরূপে তাহার স্ত্রীকে বাহির করিতে আর কত বিলম্ব হইবে?

রাম। উত্তম পরামর্শ বলিয়াছ, তুমি আমার উপযুক্ত বুদ্ধিদাতাই বটে; তোমার এরূপ বুদ্ধি না থাকিলে কি আর তোমার খুড়ো উপাধি হয়। এইরূপ করিলে লোকে কেহ নিন্দা করিতে পারিবে না, সুতরাং আমি লোকত আর তাহা হইলেই ধর্ম্মত রক্ষা পাইব।

গুণী। ধীরেনের সম্বন্ধে একটা স্থির হইল, এখন রমানাথ আর হরকালী প্রভৃতিকে জব্দ করিবার জন্য কি করিবে বল দেখি?

রাম। তুমি যখন আমার বুদ্ধিদাতা, তখন সে বিষয়ে আর আমার ভাবনা কি?

গুণী। আচ্ছা, সে বিষয়ে তখন পরে পরামর্শ করা যাইবে। হাঁ বলিতেছিলাম কি, আজ আমিত বড় বিপদে পড়িয়াছি, গৃহিণীর আবার জ্বর হইয়াছে, কেদার ডাক্তারকে ডাকিতে গিয়াছিলাম, পূর্ব্বের অনেক গুলি টাকা পাওনা আছে বলে সেত আসিল না। এখন গোটাকতক টাকায় কি করি?

রাম। তাইত, টাকা—টাকা—টাকাত—আমার হাতে—আচ্ছা কত টাকা হইলে এখন চলিতে পারে বল দেখি?

গুণীরাম রামগোপালকে বিলক্ষণ চিনিত, টাকাকে যে রামগোপাল প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, তাহা কাহারই অবিদিত ছিল না। সেই জন্য মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"এই—গোটা দশেক হইলেই এখন চালাইয়া লইতে পারি।"

রামগোপাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বহু কষ্টে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দশ টাকা আনিয়া গুণীরামের হস্তে দিলেন। গুণীরাম টাকা কয়েকটি পাইয়া মনে মনে বলিল "তোমার কাছে টাকা বাহির করা সহজ নহে, অনেক বুদ্ধিখরচ করিয়াছি বলিয়া এই দশ টাকা বাহির হইল, যখন একবার হাত খসিয়াছে তখন এইরূপে অনেক বাহির করিব।" প্রকাশ্যে বলিল—"এখন আমি আসি, পরে দেখা করিব। এখন যেরূপ স্থির হইল তাহাই কর।"

এই বলিয়া গুণীরাম চলিয়া গেল। রামগোপাল প্রথমে টাকা কয়েকটির জন্য কিছু বিষণ্ণ হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু তাঁহার মুখ আবার প্রফুল্ল দেখা গেল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারে।

এইবার ধীরেন্দ্রের উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ হইল। বিনা দোষে বা সামান্য দোষে ধীরেন্দ্র সকলের নিকট বিলক্ষণ তিরস্কার খাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে ধীরেন্দ্রের মনে কষ্ট হইলেও তিনি সে সকল কষ্ট কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। সকলের অপেক্ষা শশীকলার অত্যাচার কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। আমরা গোপনে অনুসন্ধান পাইয়াছি যে, ইহাতে মহেন্দ্রেরও বিশেষ উৎসাহ ছিল। মহেন্দ্রের নিকট শশীকলা কৌশলে ধীরেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিবার কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল, এবং মনে মনে ঠাকুর ঠাকুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। আমরা এরূপ ও শুনিয়াছিলাম যে শশিকলা আনন্দে এতদূর অধীরা হইয়াছিল, যে এই শুভ সংবাদের কথা

গুনিয়া ৺কালিমাতার পূজার কারণ পাঁচ টাকা তুলিয়া রাখিয়াছিল। শশিকলা প্রথমে নানা রকমে ধীরেন্দ্রকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিল। ধীরেন্দ্র সময়ে আহার করিতে পাইত না, যাহাও পাইত তাহাতে উদর পূর্ণ হইত না। ধীরেন্দ্রের পরিধেয় বস্ত্র সকল কি জানি কেন ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল, সংসারে সামান্য চাকরের কার্য্য সকল এখন হইতে ধীরেন্দ্রকে করিবার ভার হইতে লাগিল। সংসারে আর কোনরূপ তাহার সম্মানই রহিল না। চাকর চাকরাণীতে পর্য্যন্ত তাহাকে অপমান করিতে লাগিল।

এই সকল অত্যাচারে ধীরেন্দ্র ততদূর ব্যথিত না হইলেও চপলার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। কিন্তু চপলার সহিষ্ণুতারও সীমা ছিল না। চপলা কেবল মনে মনে ভাবিত সকলের এরূপ ভাব হইল কেন? চপলা বালিকা, সংসারে তাহার কোন প্রভুত্বই নাই, সে আর কি করিবে—কেবল দাসীর ন্যায় সংসারে দিবারাত্র কাজকর্ম্ম করিত, আর কাজ করিতে করিতেই কেবল ঐ কথা ভাবিত; আর গৃহে যে নারায়ণ আছেন, প্রত্যহ তাঁহার নিকট মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিত, "হে ঠাকুর, আমাদের প্রতি সকলের মনের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেন? তুমি দয়া করিয়া ইহার কোন উপায় করিয়া দাও—যেন পূর্ব্বের ন্যায় সকলে তাঁহাকে ভালবাসে।" গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া অবসর পাইলে যখন চপলা রাত্রে শয়ন করিত, অনেকক্ষণ চপলার নিদ্রা আসিত না, কেবল এক মনে ঐ সকল কথা ভাবিত, আর ধীরেন্দ্রের অজ্ঞাতসারে অতি সাবধানে দুই চারি বিন্দু চক্ষের জলও ফেলিত। একদিন রাত্রে ঐরূপ গোপনে নিঃশব্দে চপলা চক্ষের জল ফেলিতেছিল, কিন্তু ধীরেন্দ্র আজ তাহা জানিতে পারিল। ধীরেন্দ্র জানিতে পারিয়া বলিল—

"চপলা, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

চপলা। কাঁদিব কেন?—দেখ, একটা কথা মনে ভাবিলেই আমার কেমন হঠাৎ চক্ষে জল আসে, আমি ইচ্ছা করিয়া কাঁদি না।"

ধীরে। কি কথা চপলা?

চপলা। মেজ দিদি যাওয়া পর্য্যন্ত সকলেই তোমায় বিনা দোষে তিরস্কার করে, কেহ আর তোমায় তেমন যত্ন করে না।

চপলার পোড়া চক্ষে আবার জল আসিল, আরো কি বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বলিতে গেলে পাছে চক্ষের জল গোপন করিতে না পারে, আর ধীরেন্দ্র সেই চক্ষের জল দেখিতে পাইয়া মনে কষ্ট পায়, সেই জন্য চপলা চুপ করিল।

ধীরেন্দ্র বলিল—"আমার অপেক্ষা তোমায় যে অধিক তিরস্কার হয় চপলা। আবার তাহার উপর তোমায় সংসারে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়। তুমি একে এখনও বালিকা তাহার উপর এই সকল অত্যাচার। আমি পুরুষ হইয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি।"

চপলা। আমায় সকলে হাজার তিরস্কার করুক, হাজার আমায় পরিশ্রম করিতে হউক, তাহাতে আমার কোন কষ্টই হয় না; কেবল কষ্ট হয় তোমার মুখখানি শুষ্ক দেখিলে। তোমার প্রফুল্ল মুখ দেখিলে আমি ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে পারি। তুমি আমায় বল আর না বল, কিন্তু তোমার মনের ভিতর যে কিরূপ হয় আমি কি তাহা জানিতে পারি না?

ধীরে। চপলা, সে কথা জানিয়া তোমার কাজ নাই। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও, যে দিন আমি তোমায় সুখী করিতে পারিব, সেই দিন তুমি আমার মুখ প্রফুল্ল দেখিবে। আমি মনে করিতেছি এইবার উপায়ের চেষ্টায় কলিকাতায় যাইব, উপায় করিতে না পারিলে সংসারে সম্মান থাকে না। মেজ বউ এখানে থাকিলে এতদিন যাইতাম, কারণ তাহা হইলে আমি যেখানে থাকি তোমার বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কাল যে পত্র পাইয়াছি তাহাতে যে মেজ বউ শীঘ্র আসিতে পারেন তাহা বোধ হয় না, কারণ তাঁহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত। সুতরাং আমি তাঁহার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি না। এখন তোমার মত হইলে আমি কলিকাতায় যাইতে পারি।"

চপলা। আমার আবার মতামত কি? তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, যাহাতে তুমি সুখী হও, তাহাই কর, তবে মেজ দিদি এখানে নাই, তুমিও যাইলে বড় কষ্ট হইবে। তা, কষ্ট হইলেই বা কি করিব?

চপলা মুখে এই কথাগুলি বলিল বটে, কিন্তু ধীরেন্দ্রের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল। বালিকা একবার অতৃপ্ত-লোচনে ধীরেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু মুখের দিকে চাহিতেই আবার

চপলার চক্ষে জল দেখা গেল, ধীরেন্দ্র সেই চক্ষের জল মুছাইয়া বালিকার মুখচুম্বন করিল।

পর দিন প্রাতে রামগোপাল ধীরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল—"আমি দেখিতেছি আমার পরিবারবর্গের কাহার সহিত তোমার সদ্ভাব নাই; সকলেই তোমার উপর বিরক্ত; দোষ যাহারই থাকুক সে বিষয়ে আমি কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু এই সকল কলহে আমি বড় বিরক্ত হইয়াছি, তুমি এখন আপনার উপায়ের চেষ্টা কর, গৃহে বসিয়া কলহ করিলে আর কি হইবে? আরও আমি তোমার বিপক্ষে অনেক কথা শুনিয়াছি, তোমায় আর আমি স্পষ্ট করিয়া কিরূপে বলিব, তুমি আপনার পরিবার প্রতিপালনের উপায় কর। অদ্যই কলিকাতায় কিম্বা যেখানে তোমার অভিপ্রায় হয় যাও।"

রামগোপালের এই সকল কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রের বড় অভিমান হইল, ধীরেন্দ্র সেই দিনেই কলিকাতায় রওনা হইবার মনস্থ করিল। চপলাকেও মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া মাত্র দুই চারি কথায় বিদায় লইয়া ধীরেন্দ্র সেই দিনেই বিষণ্ণ মনে বাড়ি হইতে বাহির হইল। কেবল যাইবার সময় প্রিয় সখাকে একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল। বেলা ১১টা বাজিয়াছে, তখনও ধীরেন্দ্রের স্নানাহার হয় নাই, স্নান আহার না করিয়াই আজ ধীরেন্দ্র বাড়ি হইতে বহির্গত হইল, কেহই তাহাকে সেরূপ যত্ন করিল না, কেহই তাহাকে একবার স্নানাহার পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে বলিল না। চপলা বালিকা সে আর কি করিবে? গোপনে চক্ষের জল মুচিতে মুচিতে রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া নিজের অন্নব্যঞ্জন গোপনে একজন দরিদ্র স্ত্রীলোককে ডাকিয়া দিল। আজ ধীরেন্দ্র না খাইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, আজ আর চপলার অন্নব্যঞ্জন মুখে উঠিবে কিরূপে?

ধীরেন্দ্র নিজ গ্রামের বাজারের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে, সেই সময় গুণীরাম খুড়োর সহিত সাক্ষাৎ হইল। গুণীরাম ধীরেন্‌কে দেখিয়া যেন কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—"ধীরেন্, তুমি এত বেলায় কোথায় যাইতেছ, তোমার মুখখানি শুষ্ক, কোন বিপদ হয় নাই ত।"

ধীরেন্। আজ্ঞে না; আমি কলিকাতায় যাইতেছি।

গুণী। কলিকাতায় যাইবার কোন বিশেষ কারণ আছে না কি?

ধীরে। বিশেষ কারণ কিছুই নাই।

গুণী। তবে এত বেলায় যাইতেছ কেন? তোমার স্নানাহার হইয়াছে ত?

ধীরে। স্নানাহার হয় নাই।

গুণী। বিশেষ কারণ কিছুই নাই বলিতেছ, অথচ এত বেলায় স্নানাহার না করিয়াই চলিয়াছ?

ধীরেন্দ্র এই প্রশ্নের কোন উত্তরই করিতে পারিল না, নীরবে রহিল। গুণীরাম তখন বলিল—"আমার নিকট কোন কথা গোপনকরা তোমার উচিত নয়, আমি তোমার বিষয়ে সমস্ত কথাই জানি, সে দিন রামগোপালকে তোমার সাপক্ষে দুই চারি কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া আমিও তাঁহার নিকট যথেষ্ট তিরস্কার খাইয়াছি। তাঁহারই মুখে সেই দিন শুনিলাম যে তিনি তোমায় কৌশলে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবেন। তোমার পরিবারের গহনা গুলিও তিনি নাকি কৌশলে হস্তগত করিয়াছেন। এখন দেখ, সে দিন রমানাথ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। তুমি যদি এখনও আমার কথা শুন, আমি ইহার কোন উপায় করিয়া দিতে পারি।"

ধীরে। আপনি কি উপায় করিবেন?

গুণী। উপায় অন্য আর কি, তুমি যদি মকর্দ্দমা কর, এখনি সমস্ত বিষয় পাইতে পার।

ধীরে। মকর্দ্দমা করিয়া বিষয় লওয়া আমার সাধ্যাতীত।

গুণী। কেন, আমি তোমায় এমন লোক ঠিক করিয়া দিতে পারি, যিনি সমস্ত খরচ পত্র দিয়া মকর্দ্দমা চালাইবেন। মকর্দ্দমা জিত হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা দিলেই হইবে।

ধীরে। তুচ্ছ বিষয়ের জন্য গুরুলোকের সহিত বিবাদ করা আমার ইচ্ছা নহে।

গুণীরাম তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তবে কি তোমার সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিবে?"

ধীরে। বিবাদ করা অপেক্ষা আমার বিবেচনায় তাহাই ভাল।

গুণী। বল কি! এতদূর অত্যাচার তুমি ব্যাটা ছেলে হইয়া সহ্য করিবে?

ধীরে। যতদিন সহ্য করিতে পারিব সহ্য করিব, যখন নিতান্তই অসহ্

হইবে, তখন বিষ খাইয়া এই জীবন ত্যাগ করিব। মনে করিলেইত মানুষ মরিতে পারে।

ভগীরাম এই কথা শুনিয়া বড় বিরক্ত হইয়া বলিল—"তোমার মতন বোকাত কোথাও দেখি না হে?" কিন্তু তাহাতেও ধীরেন্দ্র কোন কথা কহিল না। তখন ভগীরাম ধীরেন্দ্রকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিল। রাম-গোপাল তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে,এবং ভবিষ্যতে যেরূপ করিবে সমস্ত কথাই ধীরেন্দ্রকে বলিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার মন টলিল না। তখন ধীরেন্দ্রের উপর ভগীরাম খুড়োর বড়ই রাগ হইল। সে আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল— "এত চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না, এই মকর্দ্দমা বাধাইতে পারিলে বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হইত, যাহা হউক এখন এই রমানাথ আর হরকালির সঙ্গে রামগোপালের কোনরূপ একটা মকর্দ্দমা বাধাইবার চেষ্টা করা যাউক।"

ভগীরাম চলিয়া যাইলে ধীরেন্দ্র সেই বাজারের এক দোকানে বসিয়া কিছু জলযোগ করিয়া কলিকাতা যাইবার মানসে বশুলাষ্টেশনাভিমুখে পদব্রজেই চলিল। গাড়ী করিয়া যাইবার ক্ষমতা আজ আর তাহার ছিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনী।

প্রিয়ম্বদার পিত্রালয় বসন্তনগর। বসন্তনগর উমীপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। প্রিয়ম্বদার পিতা বিশ্বনাথ একজন এই গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ধন, মান, যশ, তাঁহার যথেষ্ট আছে, তাঁহার জমিদারীর বাৎসরিক আয় প্রায় ৬।৭ হাজার টাকা হইবে, ইহা ব্যতিত বিশ্বনাথের নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে, তিনি সে টাকায় তেজারতি করিয়া ও বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। গ্রামে এরূপ জনরবও ছিল, যে বিশ্বনাথ নগদ একলক্ষ টাকা গণিয়া দিতে পারেন। তাঁহার ব্যয় ও অল্প ছিল না, তবে লোকে যাহাকে হিসাবী

লোক বলে, তিনি সেই দরের লোক ছিলেন। বিশ্বনাথের প্রিয়ম্বদা ব্যতীত অন্য সন্তান সন্ততি কেহ ছিল না, অল্প বয়সেই তাঁহার গৃহিণীর কাল হয়, তিনি অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই। সংসারে তাঁহার এক ভগ্নী আছে, তিনিই প্রিয়ম্বদাকে লালনপালন করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথের অমরনাথ বলিয়া এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, আজ ৭।৮ বৎসর হইল এক মাত্র পুত্র বীরেশ্বরকে রাখিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বীরেশ্বরের সহিত বিশ্বনাথের পৃথক্ অন্ন, বিষয় পর্য্যন্ত সমস্তই পৃথক, কোনরূপ গোলযোগ নাই। বিশ্বনাথের পিতা ভবিষ্যতে যাহাতে কোনরূপ বিবাদ না হয়, সেই জন্য মৃত্যুকালে দুই পুত্রকে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের ন্যায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেশ্বরের সেরূপ জমিদারীর আয় কিম্বা নগদ সম্পত্তি ছিল না। বীরেশ্বর কলিকাতায় কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করিতেন, এক্ষণে সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক হইয়াছেন। ইঁহার স্বভাব চরিত্র অতি নম্র এবং বিনীত। বীরেশ্বরের স্ত্রীর নাম সুহাসিনী—ইনি যথার্থই সুহাসিনী। মুখ খানি চির প্রফুল্ল, যখনি দেখ তখনি হাস্যময়। প্রিয়ম্বদা পিত্রালয়ে আসিলে সুহাসিনীই তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী।

সুহাসিনী প্রিয়ম্বদা অপেক্ষা ৭।৮ বৎসরের বড় হইলেও পূর্ব্বাবধি উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রণয় ছিল, তবে পূর্ব্বে প্রিয়ম্বদা পিত্রালয়ে আসিলে দুই এক দিন মাত্র থাকিয়া চলিয়া যাইত, সেই কারণ সুহাসিনীর প্রিয়ম্বদার উপর বড় রাগ হইত।

এবার সুহাসিনী প্রিয়ম্বদাকে পাইয়া হর্ষ ও বিষাদে এককালীন অভিভূত হইল, আজ সুহাসিনীর দুই চক্ষেই অশ্রুবিন্দু পড়িতেছিল, কিন্তু তাহার এক চক্ষে আনন্দাশ্রু অন্য এক চক্ষে বিষাদাশ্রু। তাহার আনন্দের কারণ এবার কিছু দিনের জন্য প্রিয়ম্বদার সহবাসে সুখী হইবে বলিয়া, আর তাহার বিষাদের কারণ প্রিয়ম্বদার বৈধব্যাবস্থা দেখিয়া। প্রিয়ম্বদা আসিবা মাত্র সুহাসিনী দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল, প্রিয়ম্বদা ও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সুহাসিনীকে প্রণাম করিল। অন্য সময় হইলে সুহাসিনী প্রিয়ম্বদার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া অনে

আপনার গৃহে লইয়া যাইত, সেখানে লইয়া গিয়া সুহাসিনী কত কথাই কহিত, কত আমোদ আহ্লাদ করিত, তাহার পর ভালরূপ আহার করাইয়া পুনরায় চুলের ঝুঁটি ধরিয়া প্রিয়ম্বদাকে ঘরের বাহির করিয়া আনিত। এবার আর সেরূপ কিছুই হইল না, পরস্পরের কেহই তখন একটি কথা পর্য্যন্ত কহিল না।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই সুহাসিনী প্রিয়ম্বদার গৃহের দরজার নিকট আসিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল। প্রিয়ম্বদাকে দেখিবার জন্য এত উৎসুক যে তাহার উঠিতে যেটুকু বিলম্ব হইবে তাহাও তাহার সহ্য হইতে ছিল না। প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল, তখন সুহাসিনী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সুহাসিনীকে দরজা বন্ধ করিতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল—"দিদি, আমি উঠিয়াছি, তোমার আর দরজা বন্ধ করিতে হইবে না।"

সুহা। এত ভোরে উঠিয়া কি করিবে?

প্রিয়। তুমিইত দরজা ঠেলিয়া আমায় তুলিলে, কি করিতে হইবে তুমিই জান।

সুহা। আমি তোমায় জাগাইলাম, তোমায় জালাতন করিব বলিয়া। ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম করিবে বলিয়া তোমায় জাগাই নাই।

প্রিয়। বড় জালাতন হইয়াই তোমাদের কাছে সে জালা জুড়াইতে আসিয়াছি। তাহার উপর আমায় আবার জালাতন কি করিবে দিদি?

সুহা। অমন কথা কহিবে ত এখনি দরজায় চাবি দিয়ে চলিয়া যাইব। তোমায় জালাতন করিতে পাই নাই বলিয়া কাল রাত্রে একটি বারও চক্ষু বুজি নাই।

প্রিয়। তবে আমার কাছে আসিয়া শুইলে না কেন?

সুহা। তোমার কাছে শুইবার উপায় থাকিলে কি আমি আসিতাম না? কাল সন্ধ্যার পর যে তোমার দাদা আসিয়াছে।

প্রিয়। দাদা নাকি চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন? দাদাকে আমি অনেক দিন দেখি নাই, একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু আমার এ পোড়ার মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না।

সুহা। চাকরী ছাড়িয়া বেকার নাই, এখন যে চাকরী হইয়াছে, তাহাতে

দিন রাত্র অবকাশ নাই, সেই জন্য চেহারা ও সেইরূপ হইয়াছে। আজ ৮।৯ মাসের পর বাড়ি আসিয়াছেন, তাহা ও অল্প দিনের জন্য।

প্রিয়। তবে এ চাকরী পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই হইয়াছে, পরিশ্রম না করিলে কি দিদি অর্থ উপার্জ্জন হয়?

সুহা। এ চাকরীতে অর্থ উপার্জ্জন হয় না, বরং সঞ্চিত অর্থ ক্ষয় হয়, কেবল অর্থ কেন—অর্থ, শরীর, মন, সকলই ক্ষয় হয়।

প্রিয়। এমন চাকরী আবার কি আছে?

সুহা। সে চাকরীর নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের চাকরী।

প্রিয়। বুঝিয়াছি। দাদা, আমাদের হিন্দু ধর্ম্ম মানেন না, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন আমি জানি, এখন সেই ধর্ম্মের প্রচারক হইবার জন্য বুঝি চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, প্রচারক হইলে তবে লাভ কি?

সুহা। লাভের মধ্যে এই দেশে দেশে টংওশ টংওশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, আর ঘরে আসিলেই আমার মুখনাড়া খাওয়া।

প্রিয়। আচ্ছা দিদি, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কিরূপ?

সুহা। আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু।

প্রিয়। ছি দিদি, স্বামীর ধর্ম্মের কি নিন্দা করিতে আছে? স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নাই, স্বামী যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন, স্ত্রীকেও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সেই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে হয়।

সুহা। প্রিয়ম্বদা, তুমি যথার্থই বলিয়াছ স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নাই, কিন্তু আমি তাহার অর্থ এই বুঝি যে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, কিন্তু তা বলিয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে ধর্ম্ম বুঝিতে পারি না, আমি কেমন করিয়া বলিব যে আমি সে ধর্ম্ম বুঝিয়াছি।

প্রিয়। আচ্ছা দিদি, তুমি যখন কলিকাতায় থাকিতে তখন ত ব্রাহ্মসভায় যাইতে শুনিয়াছি, সেখানে গিয়া তুমি তবে কি করিতে বল দেখি।

সুহা। সেখানে ইচ্ছা করিয়া যাইতাম না, না যাইলে তোমার দাদার মনে কষ্ট হইবে, সেই জন্য যাইতাম, সেখানে উপাসনা হইত, চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হইত, অনেক স্ত্রীলোককে ধ্যান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ও দেখিয়াছি। আমি ভাই ধ্যান করিয়া ও কিছুই পাই নাই,

কারণ ব্রাহ্ম ধর্মে বলে ঈশ্বর নিরাকার, সুতরাং কিছুক্ষণ অন্ধকার দেখিয়া যখন মন স্থির হয় না, তখন তোমার দাদার রূপ ধ্যান করিতাম। সেইরূপে অন্তর ভরিয়া যাইত। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তোমার দাদার উপর বড় রাগ হইত, সে রাগের প্রতিশোধ ও লইতাম। সময়ে সময়ে আমার ভয়ে তোমার দাদার মনও টলিয়া যাইত।"

এই সময় খোকা ও সরোজিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সুতরাং আর কোন কথা হইল না, উভয়ে উভয়কে কোলে তুলিয়া লইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্নী সম্ভাষণে।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে বসন্ত নগরে আর কাহার সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না, অনেকেই শান্তিময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, কেবল সুহাসিনীর গৃহে একটি প্রদীপ জলিতে ছিল, তখনও সুহাসিনী নিদ্রা যায় নাই। বীরেশ্বর আজ পত্নীকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছিলেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা কত উচ্চদরের সেই সকল তত্ত্ব ধীরে ধীরে বুঝাইতেছিলেন। সুহাসিনী এক দৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। চক্ষের পলক পর্য্যন্ত যেন পড়িতে ছিল না। বীরেশ্বর তখন মনে মনে ভাবিতেছিলেন এতদিন পরে একবার সমস্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সারমর্ম্ম সকল সুহাস বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহা না হইলে ঐরূপ এক মনে এই সকল কথা শুনিবে কেন? কিছুক্ষণ পরে তিনি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "এই বার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সারমর্ম্ম ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছ?"

সুহাসিনী ঈষত হাস্য করিয়া বলিল—"কিছুই না।"

বীরে। সে কি আমার কোন্ কথা বুঝিতে পার নাই?

সুহা। তোমার সকল কথাই আমার বুদ্ধির অগম্য।

বীরে। কিসে? আমি বলিলাম ঈশ্বর এক; দেবদেবীর উপাসনা করা মহাপাপ। সেই অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, একমাত্র ঈশ্বরকে কেবল বিশ্বাস কর। ইহার মধ্যে তুমি কি বুঝিতে পারিলে না?

সুহা। ঈশ্বর এক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু অনাদি, অনন্ত নিরাকার কিরূপে বুঝিব?

বীরে। কেন? অনাদির অর্থ যাহার আদি নাই, অনন্ত অর্থ যাহার অন্ত নাই, নিরাকার অর্থ যাহার আকার নাই। এখন বুঝিয়াছ?

সুহা। ঐ সকল শব্দের অর্থ বুঝিলেই যদি ঈশ্বরকে জানা হয়, তাহা হইলে আমি অনেক দিন পূর্ব্বে ঈশ্বরকে জানিয়াছি। আর তোমার কষ্ট করিয়া আমায় ধর্ম্ম উপদেশ দিতে হইবে না, বরং এক খানি অভিধান কিনিয়া দিয়া যাইও, যখন কোন কথা বুঝিতে না পারিব, তখন সেই অভিধান খানি দেখিয়া লইব। আর তোমার মত হইলে অভিধান দেখিয়া ঐরূপ কথাগুলি বাছিয়া বাছিয়া মুখস্থ করিয়া তোমার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইতেও পারি।

বীরেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমার সকল কথায় পরিহাস। যদি কিছুই বুঝিতে না পারিয়াছিলে তবে এতক্ষণ একমনে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি শুনিতেছিল?

সুহা। আমি শুনিতেছিলাম না দেখিতেছিলাম।

বীরে। আচ্ছা, কি দেখিতেছিলে?

সুহা। তোমার মুখখানি আর তোমার হাত নাড়া আর দাড়ি নাড়া।

বীরেশ্বর কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন। তাঁহার মুখখানিও তখন কিছু গম্ভীর হইল। তিনি অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সুহাসিনীর ও তখন কিছু অভিমান হইল, তাহার সেই মুখারবিন্দ ক্রমে ক্রমে আরক্তিম হইতে লাগিল। শিশিরাভিষিক্ত পদ্মের ন্যায় সুহাসিনী তখন অবনত মুখী হইল। বীরেশ্বর তখন ভাবিতেছিলেন,—"এতদিনেও আমি সুহাসিনীর চরিত্র বুঝিতে পারিলাম না! তাহার হৃদয়ের গভীরতার পরিমাণ করা আমার সাধ্য নহে. অনেক সময় ইহার বেগবতী প্রণয় স্রোত আমায় ভাসাইয়া লইয়া

যায়, আমি অনেক সময়ে স্থির থাকিতে পারি না। এরূপ প্রেমপূর্ণ হৃদয় কি কখন ও ঈশ্বরের নিকট অবিশ্বাসী হইতে পারে?" প্রকাশ্যে বলিলেন—"সুহাস, আমি তোমায় ব্রাহ্ম ধর্ম বুঝাইতে পারিব না। তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সুহা। তবে আজ হইতে তুমি আর ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করিতে পারিবে না।

বীরে। কেন?

সুহা। আপনার সহধর্ম্মিণীকে বুঝাইতে পারিলে না, তবে অন্যকে বুঝাইবে কিরূপে?

বীরে। তোমার কাছেই হারিলাম বলিয়া অন্যের কাছে হারিব কেন? এখন এই সকল বিষয় রাখিয়া আমার এক কথা শুন দেখি।

সুহাসিনী আগ্রহের সহিত বলিল—"কি কথা?"

বীরে। আমি প্রিয়ম্বদার পুনরায় বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছি, তোমায় তাহার অভিপ্রায় জানিতে হইবে, আর এই বিষয়ে আমার সাহায্য করিতে হইবে।

সুহা। কি! বিধবা ভগ্নীর বিবাহ দিবে?

বীরে। কেন তাহাতে দোষ কি? নারীজাতির উন্নতিসাধন করাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এক প্রধান উদ্দেশ্য, কারণ নরনারীর অবস্থা সমান না হইলে কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না। আর যখন পুরুষে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে ও পুনরায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতেছে, তখন রমণীগণকে বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ না দেওয়া কি তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করা নহে? ব্রাহ্মেরা যে আজ কাল বিধবাদিগের বিবাহ দিতেছে, তাহা কি ভাল কাজ নহে?

সুহা। ভাল কি মন্দ তাহা আমার জানিবার আবশ্যক নাই, যখন তুমি বলিতেছ ভাল, তখন আমি কি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি? এখন আমার কি করিতে হইবে?

বীরে। যাহাতে প্রিয়ম্বদার বিধবাবিবাহ হয়, তাহা তোমায় করিতে হইবে।

সুহা। আর যদি প্রিয়ম্বদা নিজে বিবাহ করিতে সম্মত না হয়।

বীরে। তুমি তাহাকে বুঝাইবে যে ইহাতে কোন দোষ নাই, তাহা হইলেই সে সম্মত হইবে।

সুহা। আমি তাহাকে কি বুঝাইব। তোমার সহিত একবার দেখা করিতে প্রিয়ম্বদার ইচ্ছা হইয়াছে, তুমিই কেন দেখা করিয়া বুঝাইয়া বলিও না।

বীরেশ্বর মনে মনে ভাবিল হয়ত প্রিয়ম্বদা বিবাহ করিতে ইচ্ছুকই আছে, সেই জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছে। নতুবা বিধবা ভগ্নী ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত আর কি জন্য সাক্ষাৎ করিতে চাহিবে? তিনি ইহাও জানিতেন যে প্রিয়ম্বদা সুশিক্ষিতা এবং সুরূপা,সুতরাং এরূপ বিধবা বিবাহ করিতে অনেক সুশিক্ষিত ব্রাহ্মভ্রাতা লালায়িত হইবে। আর তিনি যদি এই বিবাহ দিতে পারেন তবে একটি বিধবা আত্মীয়াকে সমাজের নিষ্ঠুর শাসন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন আর আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তিও হইবে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বীরেশ্বর বলিলেন—"তবে কাল তুমি প্রিয়ম্বদাকে আমাদের এই ঘরে আনিয়া এই কথা পাড়িও আমি প্রথমে গোপনে থাকিয়া তাহার মনের ভাব জানিব, পরে সাক্ষাৎ করিব।"

সুহাসিনী তাহাতে স্বীকৃতা হইল; কারণ প্রিয়ম্বদা যদি ইহাতে সুখী হয়, সুহাসিনী ও সে সুখের অংশ পাইবে,এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সুহাসিনী সে রাত্র নিদ্রা যাইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রলোভনে।

এতদিন প্রিয়ম্বদার পতিভক্তিস্রোত তাহার দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে বহিতেছিল, তাহাতেই তাহার ক্ষীণ জীবন দীপ এখন ও নিভিতে পারে নাই। কিন্তু এতদিন প্রিয়ম্বদা সংসারের কোনরূপ প্রলোভনে পড়ে নাই, সুতরাং তাহার জীবনের প্রকৃত পরীক্ষা এখন ও হয় নাই। আজ প্রিয়ম্বদার এক পরীক্ষার দিন, আজ এই পরীক্ষায় জয়ী হইতে পারিলে,প্রিয়ম্বদা নবজীবন পাইবে। আজ তাহার ব্রাহ্ম ভ্রাত বীরেশ্বর প্রিয়ম্বদাকে বিধবা বিবাহের প্রলোভনে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুহাসিনী বৈকালে প্রিয়ম্বদাকে আপন গৃহে ডাকিয়া আনিল। আসিবার সময় কানে কানে

বলিল—"পোড়ারমুখী, শীঘ্র আয়, আজ একটা বড় শুভ সংবাদ আছে।" প্রিয়ম্বদা সে শুভ সংবাদ কি তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা সুহাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহে আসিল। এইখানে বলা আবশ্যক বিশ্বনাথের সহিত বীরেশ্বরের অন্ন পৃথক হইলেও তাঁহারা সেই এক পৈত্রিক বাড়িতেই বাস করিতেন। প্রিয়ম্বদাকে আপন শয়ন গৃহে আনিয়া সুহাসিনী তাহাকে তখন যত্ন করিয়া বসাইল। প্রিয়ম্বদা জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, আমার অত যত্ন করিতে হইবে না, এখন কি শুভ সংবাদ বল দেখি।"

সুহা। অত ব্যস্ত হও কেন? এই বলিতেছিলাম কি তুমি আরও কত দিন এইরূপ অবস্থায় থাকিবে?

প্রিয়। এই কি তোমার শুভ সংবাদ নাকি? তুমি ইহার উত্তর দিতে পারিলে তাহা শুভ সংবাদ হয় বটে।

সুহা। তুমি আমার কথার উত্তর দাও দেখি।

প্রিয়। আমি আর ইহার কি উত্তর দিব? যত দিন আমার সেই শুভ দিন না আসে।

সুহা। তোমার শুভ দিন শীঘ্রই আসিবে।

প্রিয়। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। দিদি, তোমার কথা যেন সত্যই হয়। সেই শেষ দিনে হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বর্গীয় স্বামীর নাম আমার কানে তুমি দিও। আর উমীপুর হইতে ধীরেন্দ্র আর চপলাকে আনিও।

সুহাসিনী এই কথায় কিছু অপ্রস্তুত হইয়া, মনে মনে আপনাকে গালি দিল, আর তখনই ভাবিল আর সে কথা উত্থাপন করিবে না, কথা চাপা দিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহার স্বামীর নিকট যাহা করিতে স্বীকৃতা হইয়াছে সে বিষয় কেমন করিয়া একবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে? সুতরাং সুহাসিনী বলিল "সে যে তোমার মরিবার দিন। সেই দিন কি তোমার শুভ দিন নাকি?"

প্রিয়। আমার আবার শুভ দিন কি আছে দিদি।

সুহা। কেন তোমার বিবাহের দিন, এখন বিধবার যে পুনরায় বিবাহ হয়।"

"তুমি যমের বাড়ি যাও।" এইকথা বলিয়া প্রিয়ম্বদা সুহাসিনীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সুহাসিনী কাৎ হইয়া পড়িয়াগেল, দেয়ালে

মাথা গিয়া আঘাৎ করিল। প্রিয়ম্বদা তখন বিশেষ অপ্রস্তুত হইল, পূর্ব্বে কখন এরূপ অন্যায় কার্য্য প্রিয়ম্বদা করে নাই। বিষণ্ণ মুখে তাড়াতাড়ি সুহাসিনীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, তোমার কি লাগিয়াছে?"

আঘাতটা কিছু গুরুতরই হইয়াছিল, কিন্তু প্রিয়ম্বদাকে ঐরূপ অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া আর ঐকারণে তাহার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়াছে বুঝিয়া সুহাসিনী কোনরূপ যন্ত্রণাসূচক ভাব প্রকাশ না করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহা না হইলে আজ সুহাসিনী ইহার বিশেষ প্রতিশোধ লইতে পারিত, কারণ এই মারামারি ঠেলাঠেলি ব্যাপারে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। সুহাসিনী বহুকষ্টের উচ্চহাসি জোর করিয়া কতক্ষণ রাখিবে তখনি সে হাসি থামিয়া গেল, তখন বলিল—"আমার মাথায় আঘাত লাগে নাই; কিন্তু লাগিলেই ভাল হইত।"

প্রিয়। কেন?

সুহা। ইহাতেই তোমার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে, তাহা হইলে তুমি কাঁদিয়া ফেলিতে। তোমায় কাঁদিতে দেখিলে আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতে পারিতাম।

প্রিয়। আচ্ছা দিদি, আমি তোমার ছোট বোন্, আমার কি অমন ঠাট্টা করা তোমার উচিৎ। যে কথা মনে হইলে অনন্ত নরক, সে কথা কি আবার কানে শোনাতে হয়।

সুহা। প্রিয়ম্বদা, যথার্থই তোমায় আমি ছোট ভগ্নির ন্যায় দেখি, সেই জন্য এ পর্য্যন্ত তোমায় আমি 'ঠাকুরঝি' বলিয়া কখন ডাকি নাই। অনেক সময় তোমায় আমি ঠাট্টা করি, গালি দিই এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করি বটে, সে কেবল তোমায় ভাল বাসি বলিয়া। কিন্তু তোমায় ঠাট্টা করিব বলিয়া আজ একথা বলি নাই, এই বয়সেই তোমার সকল সাধ আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে, আর দিন দিন তুমিও যেন সন্ন্যাসিনী হইতেছ, জীবনের সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিয়াছ; তুমি যদিও অম্লান বদনে এই সকল কষ্ট সহ্য করিতেছ বটে, কিন্তু তোমায় দেখিলে আমাদের প্রাণ যে ফাটিয়া যায়। বিধবার বিবাহ এখন নাকি চলন হইয়াছে, যদি তাহাতে তোমায় সুখী করিতে পারি——

প্রিয়ম্বদা সুহাসিনীকে আর বলিতে দিল না, বিধবার বিবাহ' কথাটি শুনিয়াই আপনার কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল সুহাসিনী তখনও কি বলিতেছে, প্রিয়ম্বদা তখন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। সুহাসিনী চুপ করিল, প্রিয়ম্বদা বলিল—"দিদি, তুমি কি আমায় এত নীচ মনে কর, এই কি তোমার ভালবাসা ?"

সুহা। আমি মনে করি না, কিন্তু তোমার দাদা মনে করেন, তাঁহার উপরোধেই আজ তোমায় এই কথা বলিলাম; আর তিনিই তোমার বিধবা বিবাহের ঘটক।

প্রিয়। কি! দাদা!!

"হাঁ আমি" বলিয়া তখন স্বয়ং বীরেশ্বর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাৎ হইলে যেমন লোকে চমকিয়া উঠে, বীরেশ্বরের অকস্মাৎ আগমনে প্রিয়ম্বদা ও সেইরূপ চমকিয়া উঠিল। পরে লজ্জায় জড়সড় হইয়া প্রিয়ম্বদা অবনত মস্তকে নিষ্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। বীরেশ্বর আসিয়া তখন প্রিয়ম্বদাকে এইরূপ উপদেশ আরম্ভ করিলেন—"তুমি আমার কথা শুন, কেন এই বয়সে জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিবে, আর আমি থাকিতে তোমায় অকূল দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিতে দিব না; আমি তোমায় সুখী করিব। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে যে এত কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে, ঈশ্বরের সেরূপ অভিপ্রায় নহে, কোন সুসভ্য দেশে এরূপ কঠিন নিয়ম প্রচলিত নাই; এই হিন্দুজাতি ব্যতিত পৃথিবীর সকল জাতির বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। এখন হিন্দুদিগের ও সেই জন্য চৈতন্য হইয়াছে, হিন্দুমতে ও ব্রাহ্ম মতে এখন অনেক বিধবা বিবাহ হইতেছে। আমি তোমার বিবাহ উপযুক্ত পাত্রে দিব।"

ব্রাহ্ম ভ্রাতার কথা শুনিয়া প্রিয়ম্বদার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল; প্রিয়ম্বদা তখন এক পা ঘামিয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রাণের ভিতর ভয়ে ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতেছিল। প্রিয়ম্বদা তখন এক মনে ডাকিতে ছিল—হে ঠাকুর! তুমি দাদাকে এমন বুদ্ধি দিলে কেন? আমি তোমার পূজা দিব, তুমি দাদার বুদ্ধি ভাল করিয়া দাও। আর এখন হইতে আমায় দ্বিগুণ বল দাও, যাহাতে আমার কোনরূপ কুবুদ্ধি না হয়।"

বীরেশ্বর পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"তুমি যাহাতে সুখী হইতে পারিবে,

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া ভবে তোমার বিবাহ দিব, আমার কথায় বিশ্বাস কর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। ইচ্ছা করিয়া কেন জীবনকে ভারবোধ করিবে? প্রথমে কষ্ট হইলেও পরিণামে তুমি সুখী হইতে পারিবে। কেমন আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে ত?

এই কথা বলিয়া বীরেশ্বর একবার প্রিয়ম্বদার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। প্রিয়ম্বদা তখনও নিরব ও নিস্পন্দ; অবনত মস্তকে কেবল সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে আপনার অন্তরের কথা জানাইতেছে। বীরেশ্বর প্রিয়ম্বদাকে নিরব দেখিয়া সুহাসিনীকে বলিলেন—"দেখ, প্রিয়ম্বদা লজ্জায় বোধ হয় কোন কথা আমায় বলিতেছে না, এরূপ লজ্জা করিবার কোন কারণই নাই; যাহা হউক আমি এইবার কলিকাতায় গিয়া এই বিষয়ে একটী স্থির করিয়া আসিব।"

সুহাসিনী তখন বলিল—"কাকা মহাশয়ের মত হইবে কেন?"

বীরে। তাঁহার মতের আবশ্যক কি? ব্রাহ্মেরা বিধবা কন্যার বিবাহে পিতার মত লয় না।

প্রিয়ম্বদা আর থাকিতে পারিল না, অভাগিনীর এসময় লজ্জা করিলে চলে কি? সেই জন্য সে সময় প্রিয়ম্বদার লজ্জা আর রহিল না। তখন গর্জ্জিয়া উন্নতস্কন্ধে বলিল—"হাঁ দাদা, তবে কি ব্রাহ্মরা অভাগিনী, অনাথা বিধবার অনিচ্ছায়, তাহার আত্মীয় স্বজনের অনিচ্ছায় দুর্ব্বল অবলা বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া বিবা—বলি দিয়া থাকে।"

বিবাহ দিয়া থাকে বলিতে প্রিয়ম্বদার গলা আটকিয়া গেল, সেই জন্য, প্রিয়ম্বদা বলিল বলি দিয়া থাকে। প্রিয়ম্বদার কথায় বীরেশ্বরের মনক্ষুণ্ণ হইল। তিনি তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তুমি নিতান্তই বালিকা, আপনার ভাল মন্দ কিসে হয়, এখনও তোমার সে জ্ঞান হয় নাই; কিন্তু তোমার সে জ্ঞান না থাকিলে যাহারা তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহাদের কথা শোনা উচিৎ। আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না প্রিয়ম্বদা।"

প্রিয়ম্বদার তখন মুখ খুলিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে কখন আমরা তাহাকে এরূপ ভাবে বীরেশ্বরের সহিত কথা কহিতে দেখি নাই। প্রিয়ম্বদা পুনরায় বলিল—"আপনি যাহাকে আমার শুভ মনে করেন, আমি তাহাকে বিশেষ অশুভ মনে করি। সুতরাং আমি কেমন করিয়া আপনার কথায় বিশ্বাস করিব।"

বীর। আচ্ছা তোমার যাহাতে ভাল হয় আমারও সেইরূপ ইচ্ছা কি না? আমি কি তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য এই কথা বলিতেছি!

প্রিয়। আপনার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই আমি জানি, কিন্তু আপনার বুদ্ধির কি ভ্রম হইতে পারে না?

বীরে। তুমি সে দিনের বালিকা হইয়াও কি আমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমতী!

সুহাসিনীর তখন আর সহ্য হইল না। কি ভাবিয়া গললগ্নকৃতবাস হইয়া করযোড়ে বীরেশ্বরকে বলিল——"হে ঘটকঠাকুর! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অনত্র এইরূপ ঘটকালীর চেষ্টা করগে। এখানে আর কেন? নিজের ভগ্নীর ছাড়কালী করিবার চেষ্টা করিতে কি তোমার লজ্জা করে না?"

সুহাসিনীর এইরূপ বিদ্রূপে বীরেশ্বরের বড়ই রাগ হইল। বীরেশ্বর সুহাসিনীর চরিত্র জানিত, সেইজন্য তাহার বিদ্রূপে কখন রাগ করিত না। কিন্তু আজ আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমায় এরূপ কথা বল।"

সুহাসিনীর কিন্তু সে কথায় রাগ হইল না, বরং ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় সেইরূপ বিদ্রূপ স্বরে বলিল "বলি ও ঘটকঠাকুর, অত রাগ কর কেন? না হয় ঘটকালীর বিদায়ের পাওনাটা আমার নিকট হইতেই আদায় করিয়া লইও।"

বীরেশ্বর তখন পুনরায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দেখ, সকল সময় তোমার পরিহাস ভাল লাগে না।"

সুহাসিনী তখন পরিহাস ত্যাগ করিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—"কি! আমি শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী, আমার পরিহাস তোমার ভাল লাগে না!"

মন্ত্রবশীকৃত সর্পের ন্যায় বীরেশ্বরের রাগ তখন এক কথাতেই জল হইয়া গেল। কিন্তু এদৃশ্য প্রিয়ম্বদার হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। পতিভক্তিপরাকাষ্ঠা পতিপরায়ণা প্রিয়ম্বদার সম্মুখে স্ত্রী কর্ত্তৃক পতির এরূপ লাঞ্ছনা সহ্য হইবে কেন? প্রিয়ম্বদা তখন সুহাসিনীর কানে কানে বলিল—"ছি দিদি, দাদাকে এরূপ কথা বলা কি তোমার উচিৎ?" সুহাসিনী প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিল না, কেবল একটু মুচকিয়া হাসিল। সে হাসিও অর্থ শূন্য

নহে, প্রিয়ম্বদা সে হাসির অর্থ বুঝিল কি না জানি না। কিন্তু সে হাসির অর্থ এই —"তুমিও আমার পতিভক্তির প্রতি সন্দেহ কর ?"

বীরেশ্বরকে প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—"দাদা, আপনারা পুরুষ, রমণীহৃদয় বুঝিবার ক্ষমতা আপনাদের কিরূপে হইবে? পতিব্রতা রমণী একবার তাহার হৃদয় মন্দিরে যে দেবমূর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে মূর্ত্তীকে চূর্ণ করিয়া তাহার স্থানে অন্য মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। স্বামী জীবিত বা মৃতই হউন, এই পৃথিবীতে বা স্বর্গেই থাকুন, ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন পতিব্রতা রমণীর হৃদয় কখনও শূন্য থাকে না। ইহাই নারীধর্ম্ম, ইহার বিপরীত যে কেন হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

প্রিয়ম্বদা আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি জানি কেন সুহাসিনী প্রিয়ম্বদার কানে কানে বলিল—"তুই চুপ কর, আমার স্বামীকে যত ইচ্ছা আমি বলিব, তুই অত কথা বলিবার কে লা?"

প্রিয়ম্বদা চুপ করিলে তখন পুনরায় সুহাসিনী বলিতে আরম্ভ করিল—"দেখ, তোমারা আপনার হৃদয়কে যে সকলের হৃদয়ের মতন মনে কর সেইটা তোমাদের ভুল। আমি মরিলে তুমিত তেরাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে নিশ্চয় বিবাহ করিবে আমি জানি; কিন্তু আমি বর্ত্তমানে যদি তুমি সহস্র বিবাহ কর, তত্রাচ তোমার ঐ দাড়িযুক্ত ভয়ানক মূর্ত্তি আমার হৃদয় হইতে কোন আবাগী কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"

বীরে। আমি আর প্রিয়ম্বদার বিবাহের কথা কখন উত্থাপন করিব না। এখন তোমারা বস, আমি একবার বাহিরে যাই।

এই কথা বলিয়া বীরেশ্বর সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। প্রলোভনে জয়ী হইয়া প্রিয়ম্বদার প্রতিভক্তিস্রোত এখন হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে বহিতে আরম্ভ করিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবনের ব্রত।

একদিন বৈকালে প্রিয়ম্বদা তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিল—"বাবা, এখানে আর কত দিন আমায় থাকিতে হইবে ?"

বিশ্বনাথ কন্যার এই কথা শুনিয়া কিছু বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন—"কেন মা, এখানে থাকিতে কি তোমার কষ্ট বোধ হয় ?"

প্রিয়। ধীরেনের এক খানা পত্র কাল পাইয়াছি, সে পত্রে আমায় শীঘ্র করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার এখানে থাকিতে কষ্ট কেন হইবে বাবা ?

বিশ্ব। আমি জানি ধীরেন্‌কে তুমি পুত্রের ন্যায় স্নেহ কর, তাহাকে না দেখিলে তোমার কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু হাঁ মা, আমিও যে তোমার এক পুত্র মা। এ ছেলের জন্য তোমার কি কষ্ট হয় না মা। আর তোমার ধীরেন্ ত মনে করিলেই তোমায় দেখিতে আসিতে পারে।

এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া গেল। প্রিয়ম্বদা সে সময় লজ্জায় অবনতমস্তকে ছিল, সুতরাং পিতার সে অশ্রুজল দেখিতে পাইল না। সে অশ্রুজল না দেখিয়াই হেঁট মুখে প্রিয়ম্বদা বলিল—"তোমার জন্য কি কষ্ট হয় না বাবা, তোমার জন্য ও কষ্ট হয়, আর ধীরেন্ এখন কলিকাতায় গিয়াছে, আমায় দেখিতে কিরূপে আসিবে ?"

বিশ্ব। না মা, এখন তোমার উমীপুরে যাওয়া হইবে না ; আমি সে দিন পীড়া হইতে উঠিয়াছি, এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হই নাই। আর বৈবাহিক মহাশয় তোমায় লইয়া যাইতে কিছুই উৎসুক দেখি না। এই বৃদ্ধ বয়সে আমার ও আর তোমায় কোথায় পাঠাইতে মন সরে না। যে কয়েক দিন আমি জীবিত থাকিব, তোমার ঐ বালক বালিকাগণকে চক্ষের আড়াল করিতে এ প্রাণ থাকিতে আমি পারিব না।

প্রিয়। যদি এই খানেই থাকিতে হইল, তবে আমার যাহাতে পরকালে ভাল হয়, এই বেলা তাহার উপায় করিয়া দাও বাবা।

বিশ্ব। তুমি এইখানে সচ্ছন্দে পরকালের কাজ করিতে পার। ব্রত, নিয়ম, পূণ্য, ধর্ম্ম তুমি সচ্ছন্দে করিতে পার, আমার যাহা কিছু আছে এই সকলিইত তোমার মা।

প্রিয়। তবে একবার গুরুদেবকে এখানে আনিলে হয় না।

বিশ্ব। আমি কালই তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইব।

পরদিন প্রত্যুষে বিশ্বনাথ প্রিয়ম্বদার গুরুদেবকে আনিতে একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই গুরুদেব আসিলেন। তাঁহার নাম কেহ এপর্য্যন্ত জানে নাই, ব্রাহ্মণ অনেক দিন সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন; পূর্ব্বপরিচয়ের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অন্য কথা ফেলিয়া সে কথা চাপা দিতেন। সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি সকল বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী অথচ তাঁহার কোনরূপ উপাধির কথা আমরা এপর্য্যন্ত শুনি নাই। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই তাঁহার কণ্ঠস্থ, অথচ সে পরিচয় তিনি এপর্য্যন্ত কাহাকে দেন নাই, কিম্বা আপনি ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টাও কখন করেন নাই। উপেন্দ্র এই মহাপুরুষের এই সকল গুণ দেখিয়া তিনি সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য প্রিয়ম্বদা এই গুরু পাইয়াছিলেন, নতুবা ইনি প্রিয়ম্বদার পিতৃ বা শ্বশুর কোন কুলেরই গুরু নহেন। আমরা ইহাকে অন্য নামে পরিচিত না করিয়া গুরুদেব বলিয়াই ডাকিব। গুরুদেব প্রিয়ম্বদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন মা আমায় ডাকিয়াছ।"

প্রিয়ম্বদা যে বিধবা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই গুরুদেব জানিতেন।

প্রিয়ম্বদা গললগ্নকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিল—"অনেক দিন আপনার পাদপদ্ম দেখি নাই বলিয়া।"

গুরুদেব তখন মনে মনে ভাবিলেন—"হরি, হরি, আমার আবার পাদপদ্ম কই? দেশে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার পা দুইখানিইত ফাটিয়া গিয়াছে, তবে কি এই ফাটা পাকেই পাদপদ্ম বলে।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"কি মনন করিয়াছ মা।"

প্রিয়। আমার এ জন্ম ত বৃথাই গেল, এখন পরকালে যাহাতে ভাল হয়, তাহার উপায় করিয়া দিন।

গুরু। এ জন্ম কেন বৃথা যাইবে মা? এই জীবনেরই সদ্ব্যবহার করিতে পার।

প্রিয়। যে হতভাগিনী নারী দেহ ধারণ করিয়া পতিসেবায় বঞ্চিত হইয়াছে তাহার জীবনের অন্য আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে।

গুরুদেব প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া কিছু প্রফুল্লিত হইয়া বলিলেন— "তোমার ন্যায় পতিব্রতা রমণী মৃতপতীর ও সেবা করিতে পারে।"

প্রিয়। কিরূপ ব্রত নিয়ম করিলে মৃত পতির সেবা করা হয়, আমাকে সেই-রূপ শিক্ষা দিন। আমি যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব যাহাতে সেই সকল দ্বারা আমার স্বর্গীয় স্বামীরই সেবা করা হয়, আমায় তাহার উপায় বলিয়া দিন। দেহ, মন, জীবন পর্য্যন্ত আমি এই কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি আমার আর কি আছে?

গুরু। মা, তুমি ধন্য, আমি তোমায় কি হিতোপদেশ দিব, সামান্য স্ত্রীলোকে যে সকল ব্রত নিয়ম করিয়া থাকে, তোমার জীবনের ব্রত সে সকল কখনই হইতে পারে না। তোমার জীবনের ব্রত অতি উচ্চ। নিঃস্বার্থ পরোপকার তুমি জীবনের একমাত্র ব্রতস্বরূপ অবলম্বন কর। নিঃস্বার্থ পরোপকার অপেক্ষা মহান ধর্ম্ম আর নাই। আত্মীয়, পর, শত্রু, মিত্র ভুলিয়া যাও—সমস্ত জীবকে এক চক্ষে দেখ। আর অর্থ না থাকিলে যথার্থ পরোপকার করা যায় না, যতদূর পার উপযুক্ত পাত্রে দান কর। আর তুমি ত ব্রহ্মচারিণী হইয়াছ, মৃত স্বামীর জন্য যে সকল ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা আমি আর কি উপদেশ দিব। এতদূর ত্যাগস্বীকার আমি জীবনে কখন দেখি নাই, কল্পনায়ও কখন ভাবি নাই। এখন হইতে জানিও তোমার সেই স্বর্গীয় স্বামীর উদ্দেশে পরোপকারই তোমার জীবনের এক মাত্র ব্রত হইল; আর এই ব্রতই ব্রহ্মচারিণীর প্রধান ব্রত।

প্রিয়। পরোপকার যে মহৎ ব্রত তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি সামান্য স্ত্রীলোক, আমি সে কঠোর ব্রত কিরূপে পালন করিতে পারিব, আমায় সেই-রূপ বল দিন্।

গুরু। না মা, তুমি সামান্য স্ত্রীলোক নহ, তুমি যখন এই ব্রতের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছ, তখন তুমি নিশ্চয় ইহা পালন করিতে পারিবে। তুমি যথার্থ ব্রহ্মচারিণী হইয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতে যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ কর। যেখানে দেখিবে নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্যক্তি রোগ যন্ত্রণায় শয্যায় ছট্‌পট্ করি-

তেছে, জাতি ও ধর্ম্ম বিচার না করিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিবে। তোমার কোন শত্রু ও যদি কখন কোন বিপদে পড়ে, আর তোমার দ্বারা যদি তাহার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাকে শত্রু জ্ঞান না করিয়া তাহার ও উপকার করিবে। আর এই কলিযুগে দানের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই, যত দূর পার, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে আহার দান করিও, তৃষিতকে জল দান করিও, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিও, রোগীকে ঔষধ দান করিও। আমি তোমার মন জানি, এ সকল কথা অধিক তোমায় আর বলিতে হইবে না। আর এখন হইতে তুমি সকল জীবকে আত্মবৎ জ্ঞান করিও।

প্রিয়ম্বদা একমনে গুরুদেবের নিকট এই সকল উপদেশ শুনিল। তাহার জীবনের গুরুতর ব্রত কিরূপে পালন করিতে হইবে, তখন তাহার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল। প্রিয়ম্বদা মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার মানসচক্ষে জীবনের সেই নূতন পথ দেখিল। প্রিয়ম্বদা এখন দেখিল—সে পথ প্রশস্ত তাহাতে কণ্টক বা অন্য কোন বাধা বিঘ্ন নাই। প্রিয়ম্বদা কেন যে এখন এরূপ দেখিল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এইবার প্রিয়ম্বদার হৃদয় বিপুল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তখন প্রিয়ম্বদা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গুরুদেবের চরণ জড়াইয়া ধরিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুশয্যায়।

"কেন বাবা, অমন কর।"

বেলা তখন চারিটা বাজিয়াছে, এখন ও কিন্তু রৌদ্রের তেজ কমে নাই, সে রৌদ্র দেখিলে চারিটা যে বাজিয়াছে, তাহা কাহার বিশ্বাস হয় না। গ্রীষ্মের ও আজ বড় প্রাদুর্ভাব, সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে শয্যায় শুইয়া বিশ্বনাথ ছট্ পট্ করিতেছে, পার্শ্বে বসিয়া প্রিয়ম্বদা পাখা হস্তে বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"কেন বাবা অমন কর।"

বিশ্বনাথ তখন অতি কষ্টে যন্ত্রণাসূচক স্বরে বলিল—"মা, আজ আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে।"

প্রিয়ম্বদা আর কোন কথা কহিল না। একজন পরিচারিকাকে নিকটে বসাইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কি ঔষধ আনিয়া পিতাকে খাওয়াইতে গেল, কিন্তু বিশ্বনাথ বলিলেন—"এখন ও ঔষধে কোন উপকার হইবে না, সেনজাকে একবার সংবাদ দাও।"

মুক্তারাম সেন গ্রামের প্রধান কবিরাজ, এ অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী চিকিৎসক আর নাই। তাঁহার অতি আশ্চর্য্য নাড়ীজ্ঞান ছিল, মৃত্যু নাড়ী চিনিতে তিনি একজন অদ্বিতীয়। প্রিয়ম্বদা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনিতে একজন লোক পাঠাইয়া দিল, প্রায় এক ঘন্টা পরে মুক্তারাম কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় আসিয়া প্রথমে রোগের লক্ষণ সকল অনেক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই তিন ছিলিম তামাকু পোড়ান হইল, মুক্তারামের ও এইরূপ একটা অপযশ ছিল যে তিন ছিলিম তামাকু না পোড়াইয়া মুক্তারাম কোন রোগীকে স্পর্শ করিত না। তাহার পর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কবিরাজের মুখ কিছু গম্ভীর হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন হইতে গত এক ঘন্টার মধ্যে কয়বার প্রস্রাব হইয়াছে?"

প্রিয়ম্বদা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"চারিবার।"

কবিরাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইরূপ ঘর্ম্ম কতক্ষণ হইতেছে।"

প্রিয়ম্বদা পুনরায় ধীরে ধীরে বলিল—"প্রায় দুই ঘন্টা।"

কবিরাজ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। দুই রকমের দুইটি ঔষধ বাহির করিয়া সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবন করাইয়া বলিলেন— "তোমরা ভাবিত হইওনা, আমি বাহিরেই রহিলাম, এই ঔষধে কিরূপ উপকার হয়, তাহা দেখিয়া তবে গৃহে যাইব।"

এই বলিয়া কবিরাজ চলিয়া যাইতেছেন, তখন বিশ্বনাথ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার পিপাসা বড় অধিক বাড়িয়াছে।"

"এই ঔষধেই উপকার হইবে" বলিয়া কবিরাজ বাহিরে আসিলেন। প্রিয়ম্বদা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই বটে, কিন্তু পিতার পীড়া যে আজ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, তাহা কবিরাজের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল।

কবিরাজ বাহিরে আসিয়া প্রথমেই বীরেশ্বরকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু

যখন শুনিলেন যে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন, তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া গ্রামের কয়েক জন সম্ভ্রান্তলোককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি বলিলেন—"মুখুর্য্যে মহাশয়ের অবস্থা আমার ভাল বোধ হইতেছে না?"

সকলেই সে কথায় কিছু বিস্মিত হইল, কারণ এখানে আসিয়া অকস্মাৎ যে এরূপ কথা তাহাদিগকে শুনিতে হইবে, আসিবার সময় কাহার মনে সে কথা উদয় হয় নাই। সে কথা সকলের অপেক্ষা একজন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধের হৃদয়ে বড় আঘাত করিল, ইনি বিশ্বনাথের জ্ঞাতি খুল্লতাত, নাম হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"সে কি সেনজা মহাশয়—ইহার মধ্যে এমন কি পীড়া প্রবল হইল?"

কবিরাজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সেই বহুমূত্র রোগই এখন সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

অন্যান্য দুই এক কথার পর সকলে মিলিয়া বিশ্বনাথকে দেখিতে অন্তঃপুরে আসিলেন, রোগী তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অস্থির, শয্যায় এক মুহূর্ত্ত ও স্থির নহে। প্রিয়ম্বদা তখন নিরবে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কিসে পিতা সুস্থ থাকেন, বিধি মতে তাহার চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বনাথ হরগোবিন্দকে বলিলেন—"খুড়ো, তোমরা থাকিতে যেন ঘরে না মরি।"

কথা শুনিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। বৃদ্ধ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তোমার মুখে আমায় এ কথা শুনিতে হইল!"

বৃদ্ধ আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কবিরাজ এই সময় পুনরায় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, কিরূপ দেখিলেন?"

কবিরাজ কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করিল মাত্র, স্পষ্ট সন্তোষজনক উত্তর না দিয়া পুনরায় তখন বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় অন্য এক ঔষধ সেবন করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন—"রোগীর সম্মুখে কোন কথা বলিতে নাই। আমি রোগীর অবস্থা ক্রমে মন্দ দেখিতেছি। যদি তীরস্থ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে আর কাল বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত নহে, এই সময় তাহার উদ্যোগ করা হউক।"

তখন সকলেরই তখনি তীরস্থ করা মত হইল, কাল বিলম্ব না করিয়া সকলে সন্ধ্যার সময় রোগীকে লইয়া বাহির হইল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে গ্রামের অনেক লোক আসিয়া ছিল; সুহাসিনীকে সকলে আসিতে নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু সুহাসিনী ছাড়িল না কারণ প্রিয়ম্বদার ইহাতে অমত ছিল না। প্রিয়ম্বদা জানিত যে পিতাকে জন্মের মত রাখিয়া আসিতে যাইতেছি, ফিরিয়া আসিবার সময় সুহাসিনী সঙ্গে না থাকিলে ফিরিয়া আসিতে পারিব কেন? প্রিয়ম্বদা এখন যদি ও সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তত্রাচ প্রিয়ম্বদা এখন ও অবলা বালিকা; সুতরাং তাহার এ আশঙ্কা হইতে পারে না কি?

এখানে আসিয়া ও প্রিয়ম্বদা যেরূপ পিতৃসেবা করিতেছিল, সেরূপ সেবা অন্য কোন স্ত্রীলোকে করিতে পারে না। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, প্রিয়ম্বদা এক মনে এক প্রাণে পিতৃসেবায় নিযুক্ত। বিশ্বনাথকে কোন কথাই বলিতে হয় না। প্রিয়ম্বদা যেন কোন দৈবশক্তি প্রভাবে সকলি জানিতে পারিত। যখন কোনরূপ যন্ত্রণা হইত, তাহার প্রতিকারের যে উপায় জানা ছিল, প্রিয়ম্বদা তৎক্ষণাৎ সে চেষ্টা করিত, যখন মলমূত্র ত্যাগের সময় হইত রোগীর বলিবারপূর্ব্বেই প্রিয়ম্বদা তাহা জানিতে পারিত। এইরূপে গঙ্গাতীরে তিন দিবস অতিবাহিত হইল; প্রথম দিন স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য হউক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক বিশ্বনাথ অনেকটা সুস্থ ছিল, তাহার পরদিন হইতে আবার রোগের বৃদ্ধি আরম্ভ হইল, পরমায়ু না থাকিলে চিকিৎসা বা সেবা দ্বারা রোগের উপশম হয় না, চতুর্থ দিনে রোগীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। প্রাতঃকাল হইতেই রোগ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, এবং দুই তিনটি নূতন উপশর্গ দেখা দিল। বেলা দুই প্রহরের সময় বিশ্বনাথ অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল—"মা, আর তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না, আমার জন্য তুমি নিজের দেহ নষ্ট করিতে বসিয়াছ। এখন আমি সুস্থ আছি, এই সময় তুমি একবার পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া আহার করিয়া আইস।"

প্রিয়ম্বদা বলিল—"না বাবা, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তের জন্য কোথায় যাইতে পারিব না। আজ আর স্নানাহার করিতে পারিব না। আজ আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে।"

বিশ্বনাথ তখন পুনরায় তাহাকে স্নানাহার করিবার জন্য বিশেষ জেদ করিয়া বলিল—"আজ তুমি স্নানাহার না করিলে আমি তোমার কোন কথা শুনিব না, আর তোমার কথায় আমিও কিছু খাইব না। তোমার ঐরূপ মুখ শুষ্ক দেখিলে আমার কি আর এক দিন ও বাঁচিতে ইচ্ছা করে, মা। তুমি বৌমাকে আমার নিকট রাখিয়া যাও।"

অগত্যা প্রিয়ম্বদা সুহাসিনীকে নিকটে বসাইয়া স্নানাহার করিতে বাধ্য হইল। বিশ্বনাথ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের সকলের আহারাদি হইয়াছে?"

তখন প্রিয়ম্বদা ব্যতিত সকলেরই আহার হইয়াছিল, সুতরাং সকলেই সে কথা বলিল। তখন বিশ্বনাথ বলিলেন—"আজ আর কেহ কোথায় যাইও না, আজ আমার শেষ দিন, এখন আমায় হরিনাম শোনাতে পার।"

তখন কেহ হরিনাম কেহ গঙ্গানাম আরম্ভ করিল, কিন্তু বিশ্বনাথ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা গঙ্গার ত কোলে শুইয়া রহিয়াছি, সকলে কেবল 'হরিনাম' কর। কিছুক্ষণ ধরিয়া হরিনাম হইল, কিন্তু কি জানি কেন সে হরিনামে বিশ্বনাথ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন—"আমার এই আসন্নকালে ঐরূপ হরিনামে হইবে না। নিকট হইতে শীঘ্র করিয়া খোল করতালের সহিত একদল বৈষ্ণব ধরিয়া আন।" একজন দৌড়িয়া গিয়া একদল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধরিয়া আনিল। তখন তাহাদের যন্ত্রাদির সহিত মিলিত সেই হৃদয়োন্মত্তকারী হরিনাম হইতে লাগিল। বিশ্বনাথের ক্ষীণ হৃদয় আবার হরিনামের মহামন্ত্রে যেন নাচিয়া উঠিল। প্রিয়ম্বদা তখন পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া হবিষ্যান্নের প্রথম গ্রাস তুলিতে যাইতেছিল, সেই হরিনামের রোল কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র হাতের গ্রাস আর মুখে উঠিল না। প্রিয়ম্বদার সে দিন আর আহার হইল না, তাড়াতাড়ি পিতার নিকট আসিল। হিন্দু বিধবা সকলি অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারে।

প্রিয়ম্বদা আসিয়া দেখিল পিতা হরিনাম সুধাপানে উন্মত্ত হইয়াছেন। তখন তাহার দেহ হইতে যেন একপ্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। রোগবিবর্ণীকৃত মুখ এখন যেন অপূর্ব্বই এক শাভা ধারণ করিয়াছে। প্রিয়ম্বদা আরো দেখিল সকলেই এখন সেই বৈষ্ণবদিগের হৃদয়োন্মত্তকারী হরিনামে

যোগ দিয়াছে, সকলই এখন সেই নামে তদ্গতচিত্ত হইয়া গিয়াছে। কুলবধূ সুহাসিনী ও সেই নামের স্রোতে ধীরে ধীরে গা ঢালিয়া দিয়াছে। প্রিয়ম্বদা দেখিল এই বহুলোক সমাগত জাহ্নবীতীরে সুহাসিনীর এখন আর লজ্জা নাই!

সেই হরিনামের কি মহিমা! মুহূর্ত্তমধ্যে প্রিয়ম্বদাও সেই নামে মোহিত হইয়া গেল। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাহারও চক্ষু ভরিয়া গেল। সেই হরিনামের সুধা তাহারও হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রিয়ম্বদা আত্মহারা হইল, এক ঘণ্টা পরে যে তাহাকে তাহার জীবনমরুভূমির একমাত্র ওয়েসিস সেই পিতৃ আশ্রয়ে বঞ্চিত হইতে হইবে, সে কথাও তখন প্রিয়ম্বদার মনে স্থান পাইল না। ক্রমে বিশ্বনাথের আসন্নকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি প্রিয়ম্বদাকে ডাকিয়া অতিক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিলেন।—

"মা, এইবার তুমি আমার নিকটে আইস। জন্মের মত একবার তোমায় দেখি। এখন আর কর্ণে শুনিতে পাই না, তোমার অমৃতময় কথা শুনিবার সাধ আমার এখন যদিও মেটে নাই। কিছুক্ষণ পরে চক্ষুতেও আর দেখিতে পাইব না, তাই বলি মা, তুমি আমার সম্মুখে এই সময় একবার আসিয়া দাঁড়াও; ঘাড় ফিরিয়া দেখিবার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর সময় নাই—এইবার আমার শেষ কার্য্য কর, এ সময় আমার শোকে সে কথা ভুলিও না। আর এখন আমি চলিলাম, সুতরাং তোমার জীবনের বিশেষ পরীক্ষা এইবার আরম্ভ হইল আশীর্ব্বাদ করি যেন তুমি সে পরীক্ষায় জয়ী হইও।"

আরো কি বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর বলা হইল না, দুই চক্ষু, তখন কপালে উঠিয়াছিল, আর বিলম্ব করা উচিৎ নয় বিবেচনা করিয়া সকলে ধরা-ধরি করিয়া, তখন গঙ্গার জলে আনিল, তখন বিশ্বনাথের অর্দ্ধদেহ গঙ্গাজলে ভাসিতে লাগিল, আর প্রিয়ম্বদার কোলে মস্তক রাখিয়া সেই অশ্রুপূর্ণ মুখখানি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বনাথের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার সেই দৃষ্টিহীন চক্ষু প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে স্থির ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর যে সে সময় কন্যার মোহে আকৃষ্ট হইয়াছে, তৎকালীন তাঁহার মুখজ্যোতিঃ দেখিলে তাহা কখনই বিশ্বাস হয় না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা গঠন।

প্রিয়ম্বদা যদিও পিতৃহীন হইয়াছে কিন্তু প্রিয়ম্বদা এখন ভাবিতেছে যে আমি নিরাশ্রয়া নহি, যিনি সকলের আশ্রয়স্থান, আমার ও আশ্রয়স্থান তিনি। কাল প্রিয়ম্বদার মনের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নাই, তাহা অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রিয়ম্বদা ভাবিত কিরূপে ধর্ম্ম পথে থাকিয়া পুনরায় স্বর্গীয় স্বামীর সহিত মিলিত হইব; প্রিয়ম্বদা অনেক সময় সে সুখ মিলনের সুখ স্বপ্ন দেখিত, কিন্তু এখন আর প্রিয়ম্বদার যে আত্মসুখেচ্ছা নাই; পুরস্কার পাইব বলিয়া ধর্ম্ম পথে থাকিব, সে ভাব প্রিয়ম্বদার এখন আর নাই। এখন প্রিয়ম্বদার কোন কামনা নাই, প্রিয়ম্বদার স্বর্গই হউক কিম্বা নরকই হউক, সে বিষয় প্রিয়ম্বদার মনে আর একবার ও উদয় হইত না, এখন প্রিয়ম্বদার সকল কর্ম্মের ফল সেই স্বামীকে অর্পণ করিয়াছে যখন তাঁহার চরণে দেহ, রূপ, যৌবন; মন, প্রাণ পর্য্যন্ত সকলি অর্পণ করিয়াছে তখন কর্ম্মফল বাকি থাকিবে কেন ?

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর প্রিয়ম্বদা এখন অতুল ধনের অধিকারিণী হইয়াছে। যাহা কেহ কখন আশা করে নাই এখন তাহা সত্য হইয়াছে, বিশ্বনাথের নগদ সম্পত্তি যে দুই লক্ষ টাকারও উপর হইবে, তাহা পূর্ব্বে কেহই জানিত না। বিশ্বনাথ যে উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নগদ ও অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই প্রিয়ম্বদাকে দান করিয়াগিয়াছেন; প্রিয়ম্বদার পুত্র সাবালক হইলে কেবল তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে, এখন সমস্ত বিষয়ই প্রিয়ম্বদার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। প্রিয়ম্বদা পিতৃধনের অধিকারিণী হইয়া কিছু মাত্র সন্তোষ হয় নাই, বরং মনে মনে বলিয়াছিল—"হে ভগবান, এ আবার তোমার কি লীলা প্রভু, আমায় ধনের প্রলোভন কেন ?" প্রিয়ম্বদা কিন্তু তখনি স্থির করিল, দিনান্তে একমুষ্ঠা হবিষ্যান্ন আর বৎসরে ২।৩ খানি গেরুয়া বসন ভিন্ন নিজের জন্য এই অর্থের অন্য কোন ব্যয় হইবে না।

প্রিয়ম্বদা পিতৃশ্রাদ্ধে অনেক দান করিয়াছিল, বিশ ত্রিশ খানি গ্রামের কাঙ্গালীকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়া দুই হস্তে বস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করা হইয়াছিল—মুক্ত কণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিয়াছিল যে এ অঞ্চলে সেরূপ কাঙ্গালী ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় পূর্ব্বে কখন হয় নাই। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা ও অল্প হয় নাই এবং তাঁহাদের ভোজন ও বিদায় সুন্দর হইয়াছিল। বিশ্বনাথের শ্রাদ্ধে ছোট বড়, ভদ্র অভদ্র, ধনী দরিদ্র সকলেই সন্তোষ হইয়াছিল, এবং সকলেই একস্বরে প্রিয়ম্বদার সুখ্যাতি করিয়াছিল।

প্রিয়ম্বদা এখন তাহার গুরুদেবের আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। প্রিয়ম্বদার যাহা হৃদয়ঙ্গম হইত কার্য্যে ও তাহা পরিণত হইত। প্রিয়ম্বদা এখন সকল প্রাণীকে সমান চক্ষে দেখিত। প্রিয়ম্বদা কোন নীচ জাতি বা জন্তুকে ঘৃণা করিত না। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় একজন কাঙ্গালির প্রসব বেদনা হয়, প্রিয়ম্বদা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজে তাহার ধাত্রীর কার্য্যকরিয়াছিল, এবং নবজাত শিশুটির যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তাহার ও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। সুহাসিনী এবং অন্যান্য সকলে ইহার জন্য প্রিয়ম্বদাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিল, কিন্তু প্রিয়ম্বদার হৃদয় তাহার জন্য কিছু মাত্র বিচলিত হয় নাই। প্রিয়ম্বদা জানিত দরিদ্রলোকের অভাব অনেক, তাহাদের উপকার করিতে পারিলেই যথার্থ পরোপকার করা হয়। সেই জন্য প্রিয়ম্বদা প্রতি দিন প্রত্যুষে দরিদ্র লোকের গৃহে গৃহে বেড়াইত, যাহার যে অভাব যতদূর সাধ্য তাহাদের সেই অভাব মোচন করিত। নিঃসহায় দরিদ্রকে রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইতে দেখিলে নিজে তাহার শুশ্রূষা এবং রোগ শান্তির উপায় করিত। এই সময় প্রিয়ম্বদা গুরুদেবের নিকট হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রিয়ম্বদার কিন্তু অনেক সময় এক বিষয়ে মনে বড় কষ্ট হইত, ধীরেন্দ্র তাহার কোন অনুসন্ধান লয় না কেন? এই তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধীরেন্দ্র কিম্বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য উমীপুর হইতে অন্য কেহ আসিল না কেন? শ্বশুরালয়ের সকলকে একবার দেখিতে প্রিয়ম্বদার বড়ই ইচ্ছা হইল। আর পিতার জমিদারীর বন্দোবস্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষত ধীরেন্দ্রকে তাঁহার বিশেষ আবশ্যক হইল, কারণ প্রিয়ম্বদার

বৈষয়িক কার্য্যের সম্পর্কে থাকিতে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। পাছে এই সকল বিষয়কর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া প্রিয়ম্বদা আত্মহারা হয়, সে ভয় ও তাহার হইয়াছিল, সেই জন্য উর্মীপুর হইতে ধীরেন্‌কে আনিয়া তাহার উপর সমস্ত নির্ভর করিবার ইচ্ছা প্রিয়ম্বদার ছিল, আর ধীরেন্দ্রকে আপনার নিকটে রাখিবার ইহা ও এক সুযোগ বটে।

প্রিয়ম্বদা একদিন একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া পদব্রজেই উর্মীপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সরোজিনী আর পুত্রকে সুহাসিনীর নিকট রাখিয়াছিল, কারণ সুহাসিনী তাহাদিগকে ছাড়িল না, আর তাহারা ও সুহাসিনীর নিকটেই থাকিতে ভাল বাসিত। পিতৃ গৃহ হইতে যখন প্রিয়ম্বদা পদব্রজে বাহির হইল, তখন গ্রামের সমস্ত লোক বিস্মিত হইল। উর্মীপুরে আসিয়া পৌঁছিতে প্রিয়ম্বদার তিন দিবস অতীত হইয়া গেল, কারণ প্রিয়ম্বদা সোজা পথ ধরিয়া আইসে নাই, এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিল। যে খানে কোন দরিদ্র লোক দেখিত, তাহার যাহা অভাব তাহা পুরণ না করিয়া প্রিয়ম্বদা সে স্থান হইতে যাইত না। এই সকলের দরুণ তাঁহার সঙ্গিনী বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। প্রথম দিন নিজগ্রাম ছাড়াইয়া যখন এইরূপ আরম্ভ হইল, তখন সেই সঙ্গিনী স্ত্রীলোক বলিল—"হাঁ দিদি ঠাকুরুণ, তুমি এত বড়লোকের মেয়ে হ'য়ে, চলে শ্বশুর ঘরে যা'চ্ছ, আবার সোজা পথে না গিয়ে এ গ্রাম সে গ্রাম দিয়ে চলেছ কেন?"

প্রিয়। এই সকল গ্রামগুলি স্বচক্ষে দেখিব বলিয়া আমি গাড়ী বা পাল্কী করিয়া আসি নাই, আর সেই জন্য সোজা পথে না গিয়া সকল গ্রামের মধ্যে দিয়া যাইতেছি।

সঙ্গি। গ্রাম দেখ্‌বার যদি এত সাধ, তবে যে সকল পাড়ায় বড় বড় বাড়ি আর দেখ্‌বার অনেক জিনিষ আছে, সে দিকে না গিয়ে যেখানে হাড়ি ক্যাওরা, ডোম, নেড়ে, এই ইতর লোক থাকে, সে সকল পাড়া দিয়া চলেছ কেন?

প্রিয়। আমার বড় বাড়ি দেখিতে ত ইচ্ছা হয় না, এই সকল গরিব দুঃখী লোকের কুঁড়ে ঘরই দেখিতে ইচ্ছা করে।

সঙ্গি। কেন ইচ্ছা হয় বলবো দিদি ঠাকুরুণ, তুমি এই সকল গরিব

লোকের দুঃখ দূর করিবে বলিয়া। তা' এরা আর তোমার গ্রামের ও লোক নয়, আর তোমার জমিদারীর প্রজা ও নয়, তবে এদের তরে তোমার এত কষ্ট সহ্য করা কেন ?

প্রিয়। আমার ত ইহাতে কোন কষ্ট বোধ হয় না, আর আমি ইহাদের দুঃখ দূর করিব কি করে দিদি ? দুঃখ দূর করিবার কর্ত্তা সেই ভগবান।

সঙ্গি। বেশত তবে তোমার এত মাথা ব্যথা পড়ে গেছে কেন ?

প্রিয়ম্বদা দেখিল সঙ্গিনী ক্রমেই রাগান্বিতা হইতেছে সেই জন্য অন্য কথা ফেলিয়া তাহাকে দুইটী টাকা দিল। সঙ্গিনী তখন আর দ্বিরুক্তি করিল না।

দ্বিতীয় দিন আর এক ঘটনা হয়, একটা গরু জলপান করিতে গিয়া কর্দ্দমে পা পুতিয়া যাওয়ায় পড়িয়া যায়। প্রিয়ম্বদা তাহাকে সেইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে কোন ক্রমেই স্বীকার করিল না। নিজে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ও তাহাকে তুলিতে পারিল না। তখন সঙ্গিনীকে সাহায্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করিল, এবং তাহাকে আবার পুরস্কারের লোভ দেখাইল, সে পুরস্কারের লোভে প্রিয়ম্বদাকে সাহায্য করিল বটে, কিন্তু মনে মনে প্রিয়ম্বদার উপর বড়ই চটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে অন্য এক ঘটনা হয়, একজন পথিক বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকে, তাহার সঙ্গে কেহই ছিল না। প্রিয়ম্বদা স্বহস্তে তাহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া ঐ রোগের যে আশ্চর্য্য ঔষধ গুরুদেবের নিকট শিখিয়া ছিল, তাহা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে নিজ ব্যয়ে পাল্কী আনাইয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়াদিয়াছিলেন। সেই দিন আবার প্রিয়ম্বদার আহার পর্য্যন্ত হয় নাই। এক বৃক্ষের তলায় হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া যেমন আহার করিতে বসিবেন অমনি একটা শীর্ণকায় কুকুর আসিয়া সম্মুখে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল, আর সেই অন্নের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। প্রিয়ম্বদা তাহা দেখিয়া সেই সমস্ত অন্ন আহ্লাদের সহিত সেই কুকুরকে ধরিয়া দিয়া উঠিয়া গেল।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালেই প্রিয়ম্বদা উমাপুরে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমে গ্রামের কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না, কারণ প্রিয়ম্বদা যে পদব্রজে পিত্রালয় হইতে আসিতেছে, ইহা একপ্রকার অসম্ভব, আর তাহার শরীরের

অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রিয়ম্বদা কিন্তু যাহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন আগ্রহের সহিত তাহার কুশল প্রশ্ন করিতেছিলেন। যখন তাহারা প্রিয়ম্বদাকে চিনিতে পারিল, তখন অনেকেই তাহাকে উন্মাদিনী মনে করিয়া বস্ত্রের অঞ্চলদ্বারা চক্ষু মুছিতে লাগিল, কিন্তু যখন তাহার সহিত কথাবার্ত্তার দ্বারা রোগের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইল না, তখন সকলেই বিস্মিত হইল। প্রিয়ম্বদা গ্রামের সকলের সহিত কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাঁহার জানা ছিল, সকলের অজ্ঞাতে তাহাদের কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া তবে বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই প্রিয়ম্বদা বাড়ির যেরূপ অবস্থা দেখিল, তাহাতে প্রিয়ম্বদা বড় আশ্চর্য্য হইল। বাড়ির সেরূপ শ্রী যেন আর নাই, যেন চারিদিকে শূন্যময় বোধ হইতেছে, বাড়িখানা যেন গিলিতে আসিতেছে। সদর বাড়িতে কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অন্দরে প্রবেশ করিয়াও প্রিয়ম্বদা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় না, তখন পা আর চলে না। তাহার সঙ্গিনী আর চুপ করিয়া না থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"বাড়িতে কে আছে গা?" তখন শশিকলা শয়ন গৃহ হইতে বলিল—"কে'রে মাগি সকাল বেলায় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিস্।"

কিন্তু গৃহিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া যখন প্রিয়ম্বদাকে দেখিতে পাইল, তখন "এস মা, এস," বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া গৃহে লইয়া গিয়া বসাইল। সে সময় গৃহিণীর চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রিয়ম্বদা তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। গৃহিনী প্রিয়ম্বার মুখচুম্বন করিলেন। প্রিয়ম্বদা তখন বলিল—"মা, আমাকে কি এতদিন ভুলিয়া থাকিতে হয়।"

গৃহি। কি করিব মা, আমরা যে কি অবস্থায় আছি, তাহা আর তোমায় কি বলিব।

প্রিয়। কেন কি হইয়াছে মা?

গৃহি। ও পাড়ার হরকালি ভট্টাচার্য্যের সহিত আমাদের মকর্দ্দমা বাধিয়াছে। সেই জন্য সেই মকর্দ্দমা লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত। দাঙ্গা হাঙ্গাম লাটালাটি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রিয়। কিসের মকর্দ্দমা মা?

গৃহি। আমরা কি জানি? এই আজ মকর্দ্দমার দিন পড়েছে, দেখ না বাড়িতে আর জন মানুষ নাই। সকলে ঘরে এলে তখন তোমাকে শুনাবো এখন।

প্রিয়ম্বদা এখন বুঝিল যে কোনরূপ দুর্ঘটনা না হইলে আর কেহ তাহার ছেলে মেয়ের সংবাদ লইবে না কেন?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সকল বুঝিল।

এই সময় শশিকলা আসিয়া উপস্থিত হইল, শশিকলার এখন আর সেরূপ শ্রী নাই, যেন কোনরূপ ভয়ানক রোগ তাহার দেহকে দিন দিন ক্ষীণ করিতেছে। শশিকলাকে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা দৌড়িয়া গিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। কিন্তু শশিকলা প্রিয়ম্বদাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইল; সে বিস্ময়ের কারণ আমরা এখন ও কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। গৃহিণী তখন গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল, শশিকলা জিজ্ঞাসা করিল—"সরোজিনী আর খোকা ভাল আছে?"

প্রিয়। তোমাদের আশীর্ব্বাদে তাহাদের কোন অসুখ নাই।

শশি। তাহাদিগকে আনিলে না কেন?

প্রিয়। আমি চলিয়া আসিয়াছি, এই রৌদ্রে তাহাদিগকে কিরূপে আনিব?

প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া শশিকলার হৃদয়ে হঠাৎ একটা আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়া ছিল, কিন্তু শশিকলা সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—"তোমার বাবা মরিয়াছেন শুনিয়াছি, কিন্তু ইহারই মধ্যে যে তোমার এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছে, যে গাড়ি পাল্কী করিয়া আসিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই, তাহা শুনি নাই। তুমি এতদূর হাঁটিয়া আসিলে কিরূপে?"

প্রিয়। আমার কোন কষ্ট হয় নাই। এখন সে কথা থাক্। চপলা কোথায় দিদি?

প্রিয়ম্বদা যেন তাহার দুঃখের কথা চাপা দিবার জন্যই এই কথা পাড়িল শশিকলা তখন এইরূপ বুঝিল, তত্রাচ অন্য কথা না উঠিয়া যে এই চপলার কথা উঠিল, ইহাতে শশিকলা হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল, কারণ চপলা যাওয়া পর্য্যন্ত শশিকলাকে সংসারের অনেক কাজকর্ম্ম করিতে হইতেছে ও শশিকলারই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া চপলা যে গৃহত্যাগিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, একথাও শশিকলার অনেক সময়ে মনে হইত; সুতরাং কাহারও মুখে চপলার কথা শুনিলেই শশিকলা বিরক্ত হইত। কিন্তু শশিকলা উত্তর করিল—"ছোট ঠাকুরপো তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছে।"

প্রিয়। ঠাকুরপো কবে আসিয়াছিলেন?

পুনরায় আবার ধীরেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করাতে শশিকলা আবার মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল, কিন্তু এবারেও সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল— "ছোট ঠাকুরপো এখন আর আমাদের বাড়ি আসিবে কেন? এখন যে সে বড়লোক হইয়াছে, কলিকাতায় তাহার যে এখন বড় চাক্‌রী হইয়াছে। সেই জন্য গোপনে শ্যামাচাক্‌রাণীর দ্বারা ছোটবৌকে লইয়া গিয়াছে। ছোটবৌ যাইবার সময় আমাদের একবার বলিয়াও যায় নাই। আর এই দুই মাসের মধ্যে কোন সংবাদও পাঠায় নাই।"

শশিকলার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া প্রিয়ম্বদা আনন্দ ও বিষাদে এককালে অভিভূত হইল। তাঁহার আনন্দের কারণ, ধীরেন্দ্রের বড় চাক্‌রী হইয়াছে শুনিয়া, আর তাহার বিষাদের কারণ ধীরেন্দ্র ও চপলার মনের এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া; এখানে আসিয়া ধীরেন্দ্র বা চপলা কাহাকেও যে দেখিতে পাইলেন না, ইহাও প্রিয়ম্বদার বিষাদের অন্যতম কারণ বটে।

প্রিয়ম্বদার শশিকলার কথায় কোন সন্দেহই হয় নাই, কারণ শশিকলার কথা যে মিথ্যা হইতে পারে, প্রিয়ম্বদার মনে সেকথা একবারও হয় নাই। কিন্তু ধীরেন্দ্র কেন যে এইরূপ গোপনে এখান হইতে চপলাকে লইয়া গেল, তাহার কারণ কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ধীরেন্দ্রের এখন বড় চাক্‌রী হইয়াছে বলিয়া যে তাহার চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা প্রিয়ম্বদার মনে স্থান পাইল না। আর এক কথা প্রিয়ম্বদা অনেকক্ষণ ধরিয়া

চিন্তা করিল। কিন্তু গোপনে চপলাকে লইয়া যাইবার কারণ কিছুই স্থির করিতে পরিল না।

সে দিবস বৈকালে প্রিয়ম্বদার সহিত অনেকে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, প্রেয়ম্বদা পিত্রালয় যাওয়া অবধি কেহ আর সে বাড়ি মাড়ায় নাই। আজ প্রিয়ম্বদা আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিতে গ্রামের অনেক বালিকা, যুবতী, প্রৌড়া, বৃদ্ধা আসিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দলে দলে আসিতে ছিল। যিনি শশিকলা কর্ত্তৃক বিনা দোষে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর চাটুর্য্যেদের বাড়ি এজন্মে কখনই যাইব না, আজ প্রিয়ম্বদা আসিয়াছে শুনিয়া তাহার সে প্রতিজ্ঞার কথা আর মনে হইল না। তিনিও পাড়ার ৩।৪ জন সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ প্রিয়ম্বদাকে দেখিতে আসিলেন। আজ যখন প্রিয়ম্বদা আসিয়াছেন শুনিয়াছিল, তখন হইতেই তাহার আর গৃহ কর্ম্মে মন ছিল না। হরকালি ভট্টাচার্য্যের সহিত মকর্দ্দমা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামে রামগোপালের সহিত একটা দলাদলি বাধিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ প্রিয়ম্বদা আসিয়াছে, শুনিয়া অনেকের সে দলাদলির কথা পর্য্যন্ত মনে হইল না ; দল বিদল আজ একত্রে দল বাঁধিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিতে আসিল। প্রিয়ম্বদা সকলেরই সহিত সমান ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলকেই সন্তোষ করিল। ইহাদের কেহ কেহ গোপনে ধীরেন্দ্র আর চপলার বিষয় কোন কথা বলিয়াছিল, এবং ইহাদেরই মুখে প্রিয়ম্বদা হরকালি ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার শ্বশুরের অন্যায় মকর্দ্দমা করার বিষয় ও কতক কতক শুনিয়া ছিলেন।

শশিকলা সেদিন বৈকালে বড়ই অস্থির হইয়াছিল, এত লোক সকলেই আজ আহ্লাদের সহিত দলে দলে প্রিয়ম্বদাকে দেখিতে আসিতেছে—শশিকলার এদৃশ্য ভাল লাগিবে কেন? শশিকলা কাহার সহিত কথা কহিল না, রাগে হিংসায় মনের আবেগে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শয্যায় শুইয়া ছট্‌ পট করিয়াছিল, এবং মনে মনে সকলকে গালি দিতেছিল।

সে দিবস এইরূপে কাটিয়া গেল ; ধীরেন্দ্র ও চপলার বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া প্রিয়ম্বদার সে রাত্রি কিছুই নিদ্রা হয় নাই। পর দিন বেলা ১০ টার সময় মহেন্দ্র ও রামগোপাল গৃহে ফিরিয়া আসিল, তাহাদের সঙ্গে গুণী

রাম খুড়োও আসিয়াছিল, হরকালি ভট্টাচার্য্যের সহিত মকর্দ্দমা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত গুণীরাম রামগোপালের বাড়িতেই থাকিত। প্রথমে রামগোপালের বাড়ির সন্নিকট কোন জমি লইয়া হরকালির সহিত দাওয়ানী মকর্দ্দমা আরম্ভ হয়, কিন্তু সেই দাওয়ানী মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই সেই জমী গুণীরাম খুড়োর পরামর্শে রামগোপাল অন্যায়রূপে দখল করিতে গিয়া দাঙ্গা হয়। রামগোপালের লাটিয়ালেরা হরকালি ভট্টাচার্য্যের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। গত কল্য মকর্দ্দমার দিন ছিল, কিন্তু সেদিন ফরিয়াদীর পক্ষের দুইজন মাত্র সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক আসামীর দুই হাজার টাকা জামিন লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়িয়া দিয়াছেন। আসামীরা আর কেহ নহে, স্বয়ং রামগোপাল এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথ। এই জন্য এই মকর্দ্দমার জন্য উভয়েই অত্যন্ত চিন্তিত আছেন।

প্রিয়ম্বদার আগমনের কথা উভয়েই শুনিল, কিন্তু সে কথা শুনিয়া পিতা পুত্র কেহই আহ্লাদিত হইল না, বরং আরো উভয়েই যেন কিছু বিমর্ষ হইল। প্রিয়ম্বদা উভয়কেই গললগ্নকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিল। কর্ত্তা কিন্তু কিছুক্ষণ পরে গৃহিনীকে ডাকিয়া বলিলেন যে বৌমাকে যেন বিশেষ যত্ন করা হয়, এবং কোনরূপ কষ্ট যেন তাঁহার না হয়। প্রিয়ম্বদা দুই তিন দিবস থাকিয়াই পিত্রালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তাঁহার আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। ইচ্ছা না হইবার ও অনেক কারণ ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান কারণ ধীরেন্দ্রের অনুসন্ধান করা।

প্রিয়ম্বদা সেইরূপ একমাত্র স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া পদব্রজেই পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। এবারেও সেইরূপ এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া ছিলেন, তবে পূর্ব্বে যে অঞ্চল দিয়া আসিয়াছিলেন, এবারে সে দিক দিয়া আসেন নাই। ফিরিয়া আসিতে তাঁহার তিন চারিদিন বিলম্ব হইয়াছিল। উমীপুর হইতে আসিবার সময় প্রিয়ম্বদা গ্রামবাসিনী কাহাকেও বলিয়া আসেন নাই, কারণ তাহা হইলে এবার এত শীঘ্র কেহই তাহাকে ছাড়িয়া দিত না। পিত্রালয়ে আসিয়াই প্রিয়ম্বদা হরনাথ সরকারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরনাথ তাহার পিতৃসংসারের একজন পুরাতন আম্‌লা। অনেকেই হরনাথকে নায়েব বাবু বলিয়া ডাকিত। হরনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রিয়ম্বদা

তাহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল, শেষে পরামর্শে এই স্থির হইল যে পর দিন প্রভাতে হরনাথ কলিকাতায় রহনা হইবেন ; এবং যেরূপে হউক ধীরেন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে ও চপলাকে প্রিয়ম্বদার নিকট আনিবেন, আর যদি এখানে আসিবার বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তবে প্রিয়ম্বদাকে পত্র লিখিলে প্রিয়ম্বদা নিজে গিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। কিন্তু ধীরেন্দ্র কলিকাতার কোন্ ঠিকনায় আছে, তাহার কোন সন্ধান হরনাথ পাইল না, কারণ প্রিয়ম্বদা অনেক অনুসন্ধানে ও সে সন্ধান পায় নাই। হরনাথ বড় চতুর লোক, সে জন্য ক্ষতি হইবে না বলিয়া প্রিয়ম্বদার নিকট হইতে সে দিন বিদায় লইলেন, এবং পর দিন প্রভাতে ধীরেন্দ্রের উদ্দেশে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অবস্থাপরিবর্ত্তনে।

কালিঘাটের পূর্ব্বাংশে একখানি দ্বিতল ভগ্ন অট্টালিকা আছে। পূর্ব্বে এই খানি যে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের ছিল, ইহার বর্ত্তমান ভগ্নাবস্থা দেখিলেও তাহা সহজে অনুমান করা যায়। এখন এই গৃহ মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত নহে ; স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া এককালীন পড়িয়া গিয়াছে, কোথায় বা পতনোন্মুখ খিলান, কড়ি, বরগা সকল এখন ও ঝুলিতেছে। অনেক স্থানে আবার বড় বড় অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ সকল জন্মিয়াছে বলিয়া তাহাদের শিকড়ে তথাকার পতনোন্মুখ ইষ্টকগুলিকে পড়িতে দেয় নাই। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকেই ভয়ানক জঙ্গল। যে প্রাঙ্গণ নানারূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত এবং বহুসংখ্যক দীপমালায় আলোকিত হইয়া এক সময়ে নৃত্যগীতাদি শ্রবণোৎসুক অসংখ্য বাবুবেশধারীর সমাগমস্থল ছিল, এখন তাহার সে শোভা নাই! শ্রীহীন হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। যে বৈঠকখানা এক সময়ে প্রতিদিন বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বিহারগৃহ ছিল, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদের উচ্চহাস্যে পরিপূর্ণ থাকিত ; এখন বহুকষ্টে তাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, উপরের ছাত ভাঙ্গিয়া পড়ি-

য়াছে; ঐ বিস্তৃর্ণ দালান খানি যদি ও এখনও দাণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় আরো কত দিন থাকিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। দালানের সে শোভা এখন আর নাই! ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতি এখন আর শোভা পায় না পঙ্খের কাজ ও আর নাই, তাহার উপর বর্ষার বারিধারার চিহ্ন সকল বসুধারা পরিবর্ত্তে এখন শোভা পাইতেছে।

প্রাঙ্গণের চারিধারে যে সকল চকের ঘর ও বারাণ্ডা ছিল, এখন তাহাদের অবস্থা ও বড় শোচনীয়। খিলান ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে, কোথায় বা ছাতের কড়ি, বরগা সকল খসিয়া পড়িয়াছে, আবার স্থানে স্থানে বারাণ্ডার ছাত এককালীন ভাঙ্গিয়া ও পড়িয়াছে। কপাট জানালা খড়্‌খড়ী যাহা কিছু ছিল, সকলি উইপোকার উদরের মধ্যে গিয়াছে, তবে এখন ও যাহা আছে, সে কেবল নাম মাত্র। কালের কি বিচিত্র গতি! অধিক দিনের কথা নয়, এই ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে যে অট্টালিকা আনন্দ ও উৎসবে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত, এখন তাহা জনমানব শূন্য—শৃগাল, কুকুর, পেঁচা, বাদুর প্রভৃতির আবাস ভূমি!!

বাস্তবিক কি এই অট্টালিকা জনমানব শূন্য! এতদিন ছিল বটে কিন্তু এখন তাহা নহে। সদর বাড়ি দেখিলে কখনই এখানে মনুষ্য বাস করে বলিয়া বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এই ভ্রম দূর হইবে। ঐ দেখ অন্তঃপুরের নিম্নতলে একটি ভগ্নগৃহ মধ্যে এক ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা একমনে কি চিন্তা করিতেছে। বালিকার মুখশ্রী বিবর্ণ, দেহ শীর্ণ, চক্ষু ক্রমে ক্রমে অশ্রুজলভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে। বালিকার এত চিন্তা কিসের জন্য? শীঘ্রই সে পরিচয় আমরা দিব। দেখিতে দেখিতে বালিকার আকর্ণবিস্তৃত নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুজল ঝরিতে আরম্ভ করিল। কোথা হইতে বিন্দুর পর বিন্দু আসিয়া জুটিতেছিল এইরূপ কিছুক্ষণ অবিশ্রান্ত অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল। হটাৎ বালিকার কি মনে হইল, বালিকা চক্ষের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে গৃহ হইতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

গৃহান্তরে আসিয়া বালিকা চুলা জালিল। হাঁড়িতে জল দিয়া চুলার উপর হাঁড়ি বসাইয়া দিয়া পুনরায় সেই ঘরে আসিল। বালিকা এবার চাউল

হইতে আসিয়াছিল, কিন্তু এ পাত্র সে পাত্র অনুসন্ধান করিয়াও কোথায় চাউল পাইল না। বালিকা বিস্মিত হইয়া দেখিল—গত রাত্রে পাত্রের মুখ বন্ধ না করায় যাহা কিছু চাউল ছিল ইন্দুরে সমস্তই উদরসাৎ করিয়া গিয়াছে। গালে হাত দিয়া বালিকা বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বালিকা কি ভাবিতে লাগিল। এই সময় কাহার পদশব্দ শুনা গেল, বালিকা চমকিয়া উঠিয়া দরজার দিকে চাহিল, তখন একজন যুবক গৃহে প্রবেশ করিল। যুবকের মুখখানি বিষণ্ণ, আসিয়াই যুবক ক্ষীণস্বরে বলিল—"আজ আর কোথায় কিছু পাইলাম না, শুধু ভাতই খাইব"। যুবকের কথা শুনিয়া বালিকার প্রাণ উড়িয়া গেল, বালিকা দুই ফোঁটা চক্ষের জল গোপনে মুছিয়া চাউলের পাত্র দেখাইয়া বলিল—"এই দেখ।"

যুবক। কি! চাউল নাই!!

বালিকা। যাহা কিছু ছিল, কাল রাত্রে ইন্দুরে খাইয়া গিয়াছে। আমার মুখে আগুণ, আমি কাল হাঁড়িতে ঢাকা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

যুবক। তবে এখন উপায়?

বালিকা। শ্যামা না আসিলে ত আর অন্য উপায় দেখি না। তাহার আসিতে সেই বৈকাল।

বালিকা আর কোন কথা কহিল না; হেঁট মুখে বসিয়া রহিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যুবক বসিয়া পড়িল। যুবক বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার মুখ আরো বিষণ্ণ হইল, চক্ষু ছলছল্ করিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরেই যুবক কাঁদিয়া ফেলিল। বালিকা তখন দৌড়িয়া নিকটে আসিয়া যুবকের চক্ষের জল মুছাইয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া যুবক বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"চপলা, কেন তুমি এখানে আমার নিকটে আসিলে? তোমায় ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা আমার হইলে নিজে গিয়া আমি তোমায় আনিতাম, কেন সে বিলম্ব সহ্য করিলে না? সেখানে দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইতে, আর না পাইলেও আমি স্বচক্ষে তাহা দেখিতাম না, আমায় এইরূপ নিদারুণ মন কষ্ট পাইতে হইত না। আমার নিজের জন্য আমি কিছু মাত্র চিন্তিত নই। কেন তুমি আসিয়া আমার গলগ্রহ হইলে? আমি কোনরূপ উপার্জ্জনের চেষ্টা

করিব না তোমায় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি। আমার এই সকল কর্কশ কথায় মনে দুঃখ করিও না, আমার মনের কিছুই স্থিরতা নাই।"

এই বলিয়া যুবক একবার সতৃষ্ণ নয়নে বালিকার প্রতি চাহিল। আর যুবকই বা বলি কেন? যুবক আর কেহ নহে, আমাদের হতভাগ্য ধীরেন্দ্র নাথ, আর বালিকা তাহারই ভার্য্যা চপলা। চপলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আমি পোড়ার মুখী; আমার জন্যই ত তোমার যত কষ্ট।"

এই বলিয়া চপলা মস্তক নত করিল, ধীরেন্দ্র দেখিল যে চপলার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল পড়িতেছে। ধীরেন্দ্র চপলার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল—"আমার সহস্র কষ্ট হউক, তাহাতে আমার কোন কষ্টবোধ হইবে না· কিন্তু চপলা, তুমি বালিকা এ বয়সে কোথায় আদর ও যত্নে থাকিবে, না দিনান্তে এক মুঠা ভাতের জন্য ও তোমার চক্ষের জল ফেলিতে হইতেছে, আর আমি তোমার স্বামী—যুবা, বলিষ্ঠ, নিরোগী, কর্ম্মক্ষম স্বামী তাহাই স্বচক্ষে দেখিতেছি।"

ধীরেন্দ্রের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, ধীরেন্দ্র আর কোন কথা বলিতে পারিল না। তখন চপলা ধীরে ধীরে বলিল—"তোমার কাছে থাকিলে আমার কোন কষ্টবোধই হয় না, তবে যে কখন কখন কাঁদি, সে কেবল তোমারই জন্য; তোমাকে সুখী দেখিলে আমার দিনান্তে একমুঠা ভাত না জুটিলে ও আমি সুখী হইতে পারি; যদি কখন ও ভগবান দিন দেন, তবে দেখিতে পাইবে, যে চপলা কখন ভাতের জন্য চক্ষের জল ফেলে নাই। তোমার শুষ্কমুখ দেখিলেই—তোমার দুঃখের কথা মনে হইলেই কেবল আমার চক্ষে জল আইসে।"

ধীরে। আমার কি গুণে তুমি আমায় এত ভালবাস চপলা? যে স্বামী আপনার স্ত্রীর ভরণপোষণ পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি সে স্বামী স্ত্রীর এতদূর ভালবাসা পাইবার কখনই উপযুক্ত নহে। এখন আমার অনেক সময় আমার মনের স্থিরতা থাকে না বলিয়া তোমার উপর মধ্যে মধ্যে কত অত্যাচার পর্য্যন্ত করি। চপলা, আমার এমন কি গুণ আছে, যে তুমি অম্লানবদনে এই সকল সহ্য কর?

চপলা। তোমার যে কি গুণ—সে গুণের কথা কি আমি একমুখে বলিব

শেষ করিতে পারি? তোমার কোন্ গুণের কথা রাখিয়া কোন্ গুণের কথা বলিব?—আমার স্বামীর ন্যায় গুণবান স্বামী আর কাহার আছে?

ধীরেন্দ্র চপলার মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে ধীরেন্দ্রের হৃদয় আহ্লাদে ফুলিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। ধীরেন্দ্র দেখিল চপলার মুখশ্রী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে যেন এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। সেই মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে ধীরেন্দ্রের চক্ষু ভরিয়া গেল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদারুণ দরিদ্র যন্ত্রণার কথা আর কিছুই মনে স্থান পাইল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে ধীরেন্দ্র সমস্ত বিস্মৃত হইল। আর চপলা? চপলাও স্বামীর গুণের কথা স্মরণ হওয়ায় তখন মোহিত হইয়া গিয়াছিল, কি অবস্থায় কোথায় তাহারা রহিয়াছে চপলারও তখন সে কথা মনে ছিল না। উভয়ে যখন এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তখন একজন স্ত্রীলোক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল, কিন্তু উভয়ের কাহারই সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। আগুন্তক স্ত্রীলোক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষ মনযোগের সহিত দেখিল, কিন্তু তখনও দম্পতি যুগলের চৈতন্য হয় নাই; সেই স্ত্রীলোক তখন ধীরে ধীরে গিয়া চপলার গাত্র স্পর্শ করিল, চপলা চমকিয়া উঠিল—ফিরিয়া দেখিয়া বলিল—"শ্যামা, তুমি কখন আসিলে?"

শ্যামা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আগে আজকার ব্যাপারখানা কি বল দেখি—পরে তোমার কথার জবাব দিব। বলি, মুখোমুখী করিয়া যেন অবাক্ হইয়া দুইজনে বসিয়া আছ কেন?"

ধীরেন্দ্র তখন অপ্রতিভ হইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সে গৃহ হইতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। চপলা শ্যামার প্রশ্নের উত্তরে আজিকার দুর্ঘটনার কথা সমস্ত বলিল, এবং ধীরেন্দ্রের যে এত বেলা পর্য্যন্ত আহার হয় নাই, এই কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে চপলার চক্ষু দুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

শ্যামা তখন বলিল—"সেই জন্য বুঝি দুই জনে মুখোমুখী করিয়া বসিয়া ছিলে? এতক্ষণ আমায় ডাক্‌তে বুঝি তোমার গতরে আগুন লাগিয়াছিল।"

এই কথা এবং আরো কত কি কথা বলিতে বলিতে শ্যামা কোথায় চলিয়া গেল, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কোথা হইতে চাউল তরকারী ইত্যাদি আনিয়া উপস্থিত

হইল। তখন চপলা আহ্লাদের সহিত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে অগ্রে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট যাহা রহিল আপনি ভোজন করিল। এখন চপলার মুখে আবার হাসি দেখা গেল, সন্ধ্যার পর শ্যামাকে লইয়া চপলা নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ করিতে লাগিল। চপলা বলিল—

"শ্যামা দিদি, তুমি না থাকিলে আমাদের দশা কি হইত?"

এইরূপ কথা শ্যামা শুনিতে ভাল বাসিত না, সুতরাং তাহার বড় রাগ হইল, শ্যামা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বলিল—"অমন কথা যদি বলিবে তবে কোন্ শালী আর তোমাদের এ বাড়ি মাড়াবে?"

শ্যামার ঐ বড় দোষ—অল্পেতেই রাগিয়া উঠে। কিন্তু চপলা সে রাগে ভীতা না হইয়া বলিল—"তুমি অন্যত্রে চাকরী করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন কর, সমস্ত আমাদের জন্য খরচ কর, সত্য বলিতেছি, তু'ই পূর্ব্ব জন্মে আমাদের কে ছিলি বল দেখি?"

শ্যামা তখন গতিক ভাল নয় বুঝিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিল, চপলাকে ইঙ্গিতের দ্বারা একটা ঘর দেখাইয়া কানে কানে বলিল—"দেখ্ ভাই, আমি সে দিন যে ভুতের গল্প করে ছিলুম, সেই ভুতটা এই ঘরের মধ্যে আছে, আমি আজ দেখতে পেয়েছি। ভুতটাকে দেখে আমার বড় ভয় হ'য়েছে।"

আর কোন কথা বলিতে হইল না, চপলা ভয়ে একেবারে শ্যামাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্যামা তখন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ধীরেন্দ্রের শয়ন গৃহে চপলাকে দিয়া আসিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

ধীরেন্দ্রনাথ কিরূপে এই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছেন, সে কথা এখনও পাঠক পাঠিকাগণকে জানান হয় নাই। এইবার সেই কথা বলিব।

কলিকাতায় আসিয়া ধীরেন্দ্র বড় বিপদে পড়িলেন, কারণ বিশেষ আত্মীয় বা পরিচিত না হইলে এখানে কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় না। কলিকাতায় ধীরেন্দ্রের সেরূপ আত্মীয় বা পরিচিত কেহই ছিল না। যে উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় ধীরেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেন যে সে উপার্জ্জন সহজ নহে, কেবল লেখা পড়া জানিলেই চাকুরী হয় না। প্রথমে ধীরেন্দ্র নিরূপায় হইয়া সহাধ্যায়ীদিগের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আজ এখানে—কাল সেখানে এইরূপে বহুকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ছাত্র—কলিকাতায় অন্য এক জনের ভরণ পোষণ যোগাইবে কিরূপে? ধীরেন্দ্র কোনরূপ চাকুরীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই সময় মাঝে মাঝে ধীরেন্দ্রের আহার পর্য্যন্ত হইত না, কোন দিন অনাহারে কাটিত, কোন দিন বা সামান্য জলযোগে কাটিত।

অনাহারে, অনিদ্রায়, মনোকষ্টে ধীরেন্দ্র দিন দিন বড় দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, ক্রমে ধীরেন্দ্রের বড় শোচনীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল। একে শীর্ণ দেহ, তাহাতে মলিন বেশ সুতরাং কোন ভদ্র সমাজে ধীরেন্দ্র সেই জন্য আর যাইতে পারিত না, কারণ সেখানে গেলে অনেকেই তাহাকে ঘৃণা করিত। এ পৃথিবীতে দরিদ্রযন্ত্রণা অপেক্ষা আর যন্ত্রণা আছে কি? এই যন্ত্রণারূপ অনলে মান, সম্ভ্রম, বংশমর্য্যাদা অবশেষে মনুষ্যজীবনের ভূষণ স্বরূপ যে চরিত্র তাহাকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়। ধীরেন্দ্রের ভিক্ষুকের ন্যায় নীচ প্রবৃত্তি ছিল না সুতরাং কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে পারিত না? বরং তাহাতে ঘৃণাই হইত। অথচ কলিকাতায় থাকিবার অন্য উপায় নাই। জীবিকা নির্ব্বাহের এখানে অন্যান্য সুসভ্য দেশের রাজধানীর ন্যায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলে উপায় হয়। ধীরেন্দ্রকে অনেক অসৎলোকে সেই পথে আনিবার চেষ্টা ও অনেক রকমে করিয়াছিল। কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক নহেন, সৎপথে থাকিয়া অনাহারে বরং জীবন বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন, তত্রাচ অসৎপথ অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার মনে উদয় হইত না।

এইরূপে ২।৩ মাস চলিয়া গেল, সঙ্গে বস্ত্রাদি যাহা কিছু ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া ধীরেন্দ্র অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন। এখন

আর কিছুই নাই. সমস্ত বিক্রয় করা হইয়াছে। একদিন ধীরেন্দ্র সমস্ত দিন রৌদ্রে এখানে সেখানে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বেলা পাঁচটার সময় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিম্নে বসিয়া এক মনে আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল, সেই সময় সেখানে অন্য এক ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, কথায় কথায় ধীরেন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে আপনার অবস্থার বিষয় সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিল। ভদ্রলোক দয়া করিয়া সেই দিন তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ি কালিঘাটে, সেইখানে তাঁহার পুত্রদিগকে ধীরেন্দ্র পড়াইত। ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল না হইলে ও ধীরেন্দ্রকে বিশেষ যত্ন করিত। এতদিন পরে ধীরেন্দ্র আশ্রয় পাইল।

একদিন ৺কালি মন্দিরের নিকট শ্যামা চাকরাণী এবং গ্রামের আরো ৩.৪ জন স্ত্রীলোকের সহিত ধীরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল, শ্যামাকে দেখিয়া ধীরেন্দ্রের আহ্লাদের সীমা ছিল না, তাহাকে যত্ন করিয়া বাসায় লইয়া গিয়া বাড়ির সকলের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক দিন সে সংবাদ ধীরেন্দ্র পায় নাই, অনেক সময় তাহার জন্য ধীরেন্দ্র উদ্বিগ্ন থাকিত, আজ শ্যামার মুখে সমস্ত কুশল সংবাদ পাইয়া ধীরেন্দ্রের মন অনেক সুস্থির হইল। সকলের কথা জিজ্ঞাসা করা শেষ হইয়া গেল, কিছুক্ষণ নিরবে থাকিয়া ধীরেন্দ্র বলিল—"আর ছোট বউ কেমন আছে শ্যামা?"

এই কথায় শ্যামা যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"সে কথায় তোমার আবশ্যক কি ছোট বাবু?"

ধীরে। কেন শ্যামা এরূপ কথা বল?

শ্যামা। রাগ কর না ছোট বাবু, তোমার ব্যবহার দেখিয়া বলি, রক্ত মাংসের শরীর যে এমন কঠিন, তাহা আমরা জানিতাম না, তোমার এখানে আসা পর্য্যন্ত ছোট বউয়ের যে কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে, তাহা আর তোমাকে কি বলিব? একে সংসারে নানা যন্ত্রণা পায়, তার উপর তোমার কোন সংবাদ পায় নাই, ছোট বউ ভেবে ভেবে আধখানি হ'য়ে গেছে। তাহার কি আর তেমন শরীর আছে?

শ্যামা আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, ঝর্ ঝর্ করিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষের জল পরিধেয় বস্ত্রের

অঞ্চলে মুছিয়া শ্যামা পুনরায় বলিল—"আমি কলিকাতায় আসিব শুনিয়া আমার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে যেরূপ মিনতি করিয়া তোমার সহিত দেখা করিবার কথা বলিয়াছিল, সে কথা মনে হ'লে আর জ্ঞান থাকে না। আমি কলিকাতায় তোমায় অনেক খুঁজিয়াছিলাম, কিন্তু কোন পোড়ালোকে তোমার খপর দিতে পারিল না। ভাগ্যি, মা কালির কাছে তেমন করে মাথা খুঁড়ে ছিলাম, তাই তিনি সদয় হ'য়ে তোমার সহিত দেখা করিয়ে দিলেন। এখন তুমি কেমন আছ বল দেখি?"

ধীরেন্দ্র এতক্ষণ অবাক্ হইয়া শ্যামার এই সকল কথা শুনিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ছিল, এক্ষণে শ্যামার কথার উত্তর দেওয়া উচিৎ বিবেচনা করিয়া বলিল—"আমি ভাল আছি, কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া মন বড় অস্থির হইল, তুমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিও যে অধিক দিন আর তাহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না, কাজ কর্ম্মের সুবিধা হইলে শীঘ্রই তাহাকে আমি এখানে আনিব।"

শ্যামা। আহা! মা কালি করুন তোমার সেই দিনই যেন শীঘ্র হয়, ছুড়ির হাড়টা তা হলে জুড়ায়।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর শ্যামা ধীরেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সঙ্গিনীগণের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিল। তাহারা গ্রামে পৌছিবা মাত্র গ্রামের সকলে শুনিল যে তাহাদের সহিত ধীরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার উপর কেহ কেহ জনরব তুলিল যে কলিকাতায় তাহার চাকরী হইয়াছে। কথায় কথায় এই জনরবটা একটা প্রকাণ্ড হইয়া দাড়াইল, কেহ বলিল—ধীরেন্দ্রের একটা বড় চাক্‌রী হইয়াছে, কেহ বলিল ধীরেন্দ্র এই ২।৩ মাসের মধ্যে বড়লোক হইয়াছে। যে যেরূপ ভাবে বলুক না কেন যখন সে সংবাদ রামগোপালের বাড়িতে পৌছিল, তখন কেহ কেহ সেই সংবাদে মনে ব্যথা পাইল, কাহার বা ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। সর্ব্বাপেক্ষা শশিকলার কিছু অধিক গাত্রদাহ হইল। শশিকলা তখন শ্যামাকে ডাকিয়া ধীরেন্দ্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু শ্যামা যথার্থ কথাই বলিল যে এখনও তাহার চাক্‌রী হয় নাই, তবে শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা আছে। এ কথায় কিন্তু শশিকলার বিশ্বাস হইল না, শশিকলা মনে ভাবিল যে চপলা শ্যামাকে কোন

কথা প্রকাশ করিতে নিবারণ করিয়াছে; সেই জন্যই শ্যামা এখন ধীরেন্দ্রের বড় চাকুরীর কথা গোপন করিতেছে। এই কারণে শশিকলা চপলার সহিত শ্যামাকেও এখন হইতে বিনা দোষে তিরস্কার আরম্ভ করিল, এবং নানাপ্রকার তাহাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইতে লাগিল। একদিন তিরস্কার খাইয়া শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতেগৃহিণীর কাছে গিয়া নালিশ করিল—"হাঁগা, গিন্নি মা, আমরা গতর খাটাতে আসিয়াছি ব'লে কি বিনা দোষে এত গালমন্দ সহ্য কর্‌বো? বড় বৌ দিদি, যখন তখন আমাকে আর ছোট বৌ দিদিকে গাল মন্দ দেন কেন গা?" গৃহিণী উত্তর করিলেন—"কি বলিব মা, আমার কি কোন কথা বলিবার ক্ষমতা আছে? সেদিন আমাকেই যে সকল কথা বলিল, তাহা শুনিয়াছ ত?"

সুতরাং এই খানেই শ্যামার নালিশ চূড়ান্ত হইল, কোনরূপ প্রতিকার হইল না। শশিকলা গোপনে দাঁড়াইয়া শ্যামার কথা শুনিয়াছিল, সে কথা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিল। শশিকলার বিপক্ষে একজন দাসী নালিশ করিল, যাহা শশিকলার কখন মনেও উদয় হয় নাই, আজ তাহা স্বকর্ণে শুনিল! শশিকলা একেবারে উন্মত্তবৎ হইল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"হারামজাদী, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার নামে ঠাকুরুণের কাছে নাগাস্‌; আবার জোট বেঁধে! ছোট বউকে গাল দি, তা' তোর বাবার কি লা? দূর হ' দূর হ' দূর হ'। না দূর হ'লে ঝাঁটা মার্‌তে মার্‌তে দূর করে দেবো।"

এই ঘটনায় শ্যামার মনে বড় কষ্ট হইল, সে কোনরূপ উত্তর করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ চাকুরীতে জবাব দিয়া গৃহে চলিয়া গেল। শ্যামার গৃহ সেই গ্রামেরই মধ্যে। যাইবার সময় শ্যামা চপলার সহিত এক বার দেখা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া গিয়াছিল।

* * * * *

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে, ইতি পূর্ব্বেই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ এখনও মেঘ শূন্য নহে। সমস্তই নিস্তব্ধ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘের ভয়ানক গর্জ্জন সেই নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিতেছে। চারিদিকেই অন্ধকার—উর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে যে দিকে চাহিয়া দেখ সেই দিকেই কেবল

অন্ধকার, যেন অন্ধকার ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। আবার মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষীণালোক অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের জন্য বিকীর্ণ হইয়া সেই গাঢ় অন্ধকারকে গাঢ়তর করিতেছে। অন্ধকারের কোলে বিজলীর সেই ক্ষণ প্রভা বড়ই সুন্দর—প্রকৃতির শোভা তবে নাই কোথায়?

এই সময় সেই অন্ধকার সাগর ঠেলিয়া আকাশের সেই ক্ষণপ্রভা মাত্র ভরসা করিয়া একটি বালিকা গ্রামের মধ্যস্থিত রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছিল। এরূপ দুর্যোগে বালিকা একাকিনী চলিয়াছে, সুতরাং বালিকার গৃহ হইতে বহির্গমনের কারণ যে সহজ নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অনেকে বালিকাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া তাহার সাহসের প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বিশেষ জানি বালিকা সে প্রশংসার উপযুক্ত নহে। তবে যে কি সাহসে এই দুর্যোগ রাত্রে গৃহের বাহির হইয়াছে, তাহা বালিকাই বলিতে পারে। বহুকষ্টে বালিকা একটি ক্ষুদ্র কুঠিরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, বিদ্যুতালোকে তাহার গবাক্ষ দেখিতে পাইয়া বালিকা ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তরই পাইল না। কিছুক্ষণ বালিকা কি চিন্তা করিল, একবার মনে মনে বলিল —"আমার কি ভুল হইল?" পরক্ষণেই বিদ্যুতালোকে সে স্থান ভাল করিয়া আবার একবার দেখিয়া লইয়া বালিকা পুনরায় ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিল এবং আঘাত করিতে করিতে ডাকিল—"শ্যামা, ও শ্যামা।"

ভিতর হইতে তখন কে প্রশ্ন করিল—"কে গা?"

বালিকা উত্তর করিল—"আমি।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল—"এত রাত্রে আমি কে?"

বালিকা এবার কিছু করুণস্বরে বলিল —"একবার শীঘ্র দরজাটা খোল না?"

এইবার শ্যামা সেই স্বর শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিল, আর কোন কথা না কহিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। এই সময় আবার একবার বিদ্যুত হইল, সেই বিদ্যুতালোকে উভয়ে উভয়কে দেখিল। বালিকা দৌড়িয়া গিয়া শ্যামাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্যামা বালিকাকে লইয়া পুনরায় গৃহের মধ্যে গেল।

শ্যামার ঘরের ভিতর মালসায় আগুণ ছিল, মাচায় শুষ্ক পাতা ছিল, আগুণের উপর সেই পাতা রাখিয়া ফুঁ দিয়া শ্যামা প্রদীপ জ্বালিল। প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরের এককোনে একটি ক্ষুদ্র প্যাঁটরা হইতে একখানি বহুযত্নে সংরক্ষিত শুভ্র বস্ত্র বাহির করিয়া বালিকাকে পরিতে দিল, কারণ বালিকা যখন শ্যামাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তখনি শ্যামা জানিতে পারিয়া ছিল যে বালিকার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র। চক্ষের জল কি বৃষ্টির জলে বস্ত্র খানি ভিজিয়া গিয়াছে, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় উভয় কারণেই ভিজিয়া থাকিবে।

বালিকা-বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলে পর শ্যামা বলিল—"হাঁ ছোট বউ, এত রাত্রে আর এই দুর্য্যোগে এখানে আমার কাছে কেন?"

বালিকা আর কেহ নয়, চপলা। চপলা বলিল—"আমি কি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, তুমি চলিয়া আসিবার পর আমার উপর অনেক অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। তাহার পর বড় দিদি আমার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিয়াছে। আমি এই রাত্রটুকু থাকিবার জন্য অনেক মিনতি করিয়া ছিলাম, কিন্তু বড়দিদি খিরকীর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি অনেক্ষণ ধরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিলাম, কেহই দরজা খুলিল না। এই রাত্রে আর কোথায় যাইব? অনেক কষ্টে তোমার নিকট আসিয়াছি।"

শ্যামা চপলার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল! কপালে হাত দিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"কি আস্পর্দ্ধা! বড় বউ এতদূর করিয়াছে! আচ্ছা—, কর্ত্তা গিন্নী কি বড় বাবু কোন কথা বলেন নাই?"

চপলা। বড় দিদিকে কেহ কোন কথা বলিতে পারে কি?

শ্যামা। তুমি কি বুঝিবে? সকলেরই ইহাতে যোগ আছে। আচ্ছা, এখন তুমি কোথায় থাকিবে?

চপলা। কোথায় যাই—বাপের বাড়িতে ত কেহই নাই, নৈহাটীতে আমার এক ভগ্নির বাড়ি আছে।

শ্যামা। ছি! স্বামী থাকিতে ভগ্নিপতীর বাড়িতে থাকা কি ভাল দেখায়? তাহার চেয়ে ছোট বাবুর কাছে চল না? দেখনা তিনি তোমার কি উপায় করেন।

চপলা বসিয়াছিল উঠিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ হৃদয়ের মধ্যে কি একটা তরঙ্গ উঠিল, তাহার বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া চপলা দাঁড়াইল। শ্যামা বিস্মিত-নেত্রে চপলার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু চপলা অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। হৃদয়ের আবেগে অস্থির হইয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল, কিন্তু বসিয়াও স্থির থাকিতে পারিল না, শ্যামার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বক্ষঃ ভিজাইতে লাগিল। চপলার মনের প্রকৃত ভাব জানিতে আর শ্যামার বাকি ছিল না। শ্যামা সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"কেন কাঁদ ছোট বৌউ? তুমি ছোট বাবুরই কাছে যাও, তিনিই তোমার উপায় করিবেন।"

চপলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কে আমায় সেখানে লইয়া যাইবে?

শ্যামা।—ভয় কি ছোট বউ, আমি তোমায় সেখানে লইয়া যাইব।

যদি কেহ সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য চপলাকে দান করিত, তাহাতেও চপলার এতদূর আনন্দ হইত না, শ্যামার এই এক কথায় তাহার যতদূর আনন্দ হইয়াছিল; কিন্তু আপনার নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া চপলা আপনার কর্ণকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেই জন্যই চপলা তখনি বলিল—"তুমি কি আমার জন্য এতদূর করিবে?"

শ্যামা সহরের সুশিক্ষিতা ও সুসভ্যা স্ত্রীলোক নয়, সুতরাং কাহাকেও বাধিত করিবার প্রয়াস তাহার ছিল না। স্বদেশহিতৈষিণীর ন্যায় আত্মবিসর্জ্জনের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া বলিল।——

"আমি চাকরীতে জবাব দিয়া আসিয়াছি, ঘরে বসিয়া কি করিব? সহরে যাইলে চাকরী পাইব। আমি আমার নিজের জন্যই যাইব।"

তখন অতি প্রত্যুষেই যাওয়া স্থির হইল। ঘরে শ্যামার এক বৃদ্ধা আয়ি ছিল, শ্যামা বৃদ্ধাকে ডাকিয়া সেই ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত বুঝাইতে লাগিল। বুড়ী শ্যামার স্থানান্তরে গমনের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, কোন কথাই কানে তুলিল না। কিন্তু যখন শ্যামা বিদেশে যাইলে বেশী টাকা উপার্জ্জনের সম্ভাবনা বুঝাইয়া দিল, টাকার কি মোহিনীশক্তি! বুড়ীর কান্না অমনি থামিয়া গেল।

সে রাত্রে আর কেহ নিদ্রা গেল না, শেষ রাত্রে বড় বৃষ্টি থামিয়াছিল, সেই সুযোগে শ্যামা চপলাকে সঙ্গে লইয়া অনেক দেবদেবীকে মনে মনে

ডাকিতে ডাকিতে গৃহ ত্যাগ করিল। গ্রামের কেহ তখন শয্যাত্যাগ করে নাই, সুতরাং কাহার সহিত সাক্ষাত হয় নাই। শ্যামা নিজের সঞ্চিতধন হইতে রাহা খরচের কারণ কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়াছিল। পথে অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, তবে চপলাকে যে দেখিত সেই তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চহিয়া থাকিত। সে দৃষ্টি সু কি কু তাহার প্রমাণ আমরা এপর্য্যন্ত কিছুই পাই নাই।

ধীরেন্দ্র চপলাকে পাইয়া প্রথমে আহ্লাদে অধীর হইলেন, কিন্তু যখন শ্যামার মুখে সমস্ত কথা শুনিলেন, তখন আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। এইখানে বলা আবশ্যক যে সেই দুর্য্যোগ রাত্রে শশিকলা যে চপলাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, এই কথা চপলা ধীরেন্দ্রকে বলে নাই, কিন্তু তাহার নিষেধ স্বত্বেও শ্যামা সে কথা ধীরেন্দ্রের নিকট গোপন করে নাই। ধীরেন্দ্র তাঁহার আশ্রয়দাতাকে সমস্ত কথা জানাইলেন, সে সকল কথা শুনিয়া তাঁহারও দয়া হইল বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার জমনীর মত না হওয়ায় সস্ত্রীক ধীরেন্দ্রকে গৃহে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বীকৃত হইলেন না বটে, কিন্তু ধীরেন্দ্রের একরূপ উপায় করিয়া দিলেন। নিকটেই তাঁহার কোন আত্মীয়ের এক ভগ্ন অট্টালিকা ছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য এবং নানা প্রকার শোক পাইয়া তিনি ৺কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। আশ্রয়দাতা বন্ধু তাঁহাকে সেই স্থানে বিনা ভাড়ায় বাস করিবার উপায় করিয়া দিলেন। অন্য উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা ধীরেন্দ্র তাহাই স্বীকার করিলেন। শ্যামার অনায়ে চাকরী হইল, কিন্তু সে চাকরী নাম মাত্র, সর্ব্বদাই চপলার নিকট থাকিত। চপলা স্বামী সহবাসে অন্য কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া অনুভব করিতে পারিত না। কেবল ধীরেন্দ্রের মুখ শুষ্ক দেখিলেই চপলার চক্ষে জল আসিত। ধীরেন্দ্রের আয়ের মধ্যে আশ্রয়দাতা নরেশবাবুর নিকট হইতে মাসিক ছয় টাকা, সুতরাং তাহাতে স্ত্রীপুরুষের ভরণপোষণ অতি কষ্টেও হইত না; ধীরেন্দ্রের প্রফুল্ল মুখ শুষ্ক হইবার এই এক ভিন্ন অন্য কোন কারণ ছিল না; ধীরেন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকিত না, আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা সর্ব্বদাই করিত। আর ধীরেন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত সে আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত অজ্ঞাতবাসে থাকিবে, এমন

কি প্রিয়ম্বদাকেও আপনার দুঃখের অবস্থার বিষয় জানাইবে না; কারণ এখন তাহাকে জানান কেবল মড়ার উপর খাঁড়ার আঘাত করা মাত্র।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ সরকারের পত্র।

আজ একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, হরনাথ সরকার বসন্তনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে হরনাথ প্রিয়ম্বদাকে কোন পত্রই লেখে নাই, সুতরাং প্রিয়ম্বদা ধীরেন্দ্রের এখনও কোন সংবাদই পায় নাই। হরনাথের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা সময়ে সময়ে বড়ই চিন্তিত হইত। ব্রহ্মচারিণীর ও হৃদয় স্নেহ মমতা শূন্য নহে! ক্রমে প্রিয়ম্বদা দেখিল একমাস অতীত হইল ধীরেন্দ্রের ত কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। যাহাকে সংবাদ লইতে পাঠান গিয়াছে, এখন তাহার সংবাদ লইবার জন্য বুঝি লোক পাঠাইতে হয়। প্রিয়ম্বদা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় একটী পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্র খানি হরনাথ সরকারের লিখিত। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল।—

শ্রীচরণেষু।

প্রণামা নিবেদঞ্চ বিশেষ। পরে আপনার শ্রীচরণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া কলিকাতায় নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিয়া ধীরেন্দ্র বাবুর এতদিন কোন সংবাদ পাই নাই বলিয়া আপনাকে লজ্জায় পত্র লিখিতে পারি নাই। কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে একার্য্য যত সহজ মনে করিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, তাহা তত সহজ নহে। কারণ কেবল মাত্র নাম জানা থাকিলে এ সহরে একজন সামান্য লোকের অনুসন্ধান করা যায় না। আমি একমাস কাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধীরেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম, তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি, যে

ধীরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় আসিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতেন না। আজ এখানে কাল সেখানে এইরূপে তাঁহার পরিচিত বন্ধুদিগের বাসায় থাকিতেন। পরে তাঁহার কোনরূপ চাকুরী না হওয়ায় বড়ই কষ্ট হয়, এমন কি ভদ্রসমাজে যাইবার জন্য পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন আহারও হইত না। এইরূপ কষ্টের সময় হঠাৎ একদিন তিনি নিরুদ্দেশ হন আজ ছয় মাস গত হইল, কেহ আর তাঁহাকে কলিকাতায় দেখে নাই। সম্ভাবত তিনি চাকুরীর প্রত্যাশায় পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছেন। এক্ষণে অধীনের উপর কিরূপ অনুমতি হয় লিখিবেন। ইতি——

আজ্ঞাকারী।

শ্রীহরনাথ সরকার।

পত্র পাঠ করিয়া প্রিয়ম্বদা অনেকক্ষণ নিরব হইয়া রহিল, কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে হরনাথকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিলেন যে আর কলিকাতায় ধীরেন্দ্রের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই। পত্রপাঠ এখানে চলিয়া আসিবে। পত্র পাইয়া হরনাথকে বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। হরনাথ কলিকাতায় যেরূপ ধীরেন্দ্রের অনুসন্ধানের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যদি তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রম কালিঘাট অঞ্চলে করিতেন, তাহা হইলে বিষণ্ণ মনে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইত না।

হরনাথকে পত্র লেখা শেষ করিয়া প্রিয়ম্বদা একবার সুহাসিনীকে ডাকিয়া পাঠাইল; সুহাসিনী আসিলে তিনি হরনাথের পত্র দেখাইলেন; সুহাসিনীও সেই পত্র পাঠ করিয়া কিছু বিষণ্ণ হইল। অনেকক্ষণ উভয়েই নিরব, পরে সুহাসিনী বলিল——

"পূর্ব্বে সন্ধান করিলে নিশ্চয় কলিকাতায় তাঁহাকে পাওয়া যাইত, বোধ হয় কোন দূর দেশে চাকরী হইয়াছে, সেই জন্য চপলাকে লইয়া সেই স্থানেই গিয়াছেন। আচ্ছা, তোমাকেও কোন সংবাদ লেখে না কেন?"

প্রিয়ম্বদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ঈশ্বর জানেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে, তাহা না হইলে ধীরেন্দ্র এরূপ করিবে কেন?"

সুহা। তুমি যেরূপ ধীরেন্দ্রকে ভালবাস, আপন সন্তানকেও সেরূপ কেহ ভাল বাসিতে পারে না।

প্রিয়। বাস্তবিক দিদি আমি আমার দেবপ্রসাদ আর সরোজিনীর ন্যায় ধীরেন্দ্রকেও পুত্র বলিয়া মনে করি।

প্রিয়ম্বদার পুত্রের নাম দেবপ্রসাদ রাখা হইয়াছিল। সুহাসিনীর মনে এই সময় একটা সন্দেহের উদয় হইল, সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল—

"আচ্ছা প্রিয়ম্বদা, সকলে যেমন পুত্র কন্যাকে স্নেহ করে, তুমিত তাহার কিছুই কর না। তাহাদের প্রতি তোমার স্নেহ কিরূপ?"

প্রিয়। সকলে পুত্র কন্যাকে যেমন স্নেহ করে, আমিও তেমনি স্নেহ করি। তবে অনেকে যেরূপ তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনার হিতাহিত ভুলিয়া যায়, আমি যতদূর পারি, সেরূপ না হইতে চেষ্টা করি।

সুহা। তুমি ছেলে মেয়ে ফেলিয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, কিন্তু আর কেহ কি পারে?

প্রিয়। তাহাদের তোমার মতন স্নেহময়ী দিদি নাই, সেই জন্য তাহারা পারে না। এখন এই জন্যই তোমাকে ডাকিয়াছি, দেব আর সরোকে তোমাকে দিয়া আমি একবার তীর্থ পর্য্যটনে যাইব।

সুহাসিনী প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল, এবং নানা কারণ দেখাইয়া এরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। এই সময় প্রিয়ম্বদার গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উভয়েই আহ্লাদিত হইল। প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া দিল। গুরুদেব উপ-বেশন করিলে উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তাহার পর সুহাসিনী ধীরে ধীরে প্রিয়ম্বদার তীর্থ পর্য্যটনের অভিলাষ জানাইল এবং এরূপ ভাবে বলিল যাহাতে গুরুদেব প্রিয়ম্বদাকে যাইতে নিষেধ করেন।

গুরুদেব সকল কথা শুনিয়া প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে একবার চাহিলেন সেই মুখখানি একবার দেখিয়াই সকল কথা বুঝিতে পারিলেন, এবং ধীরে ধীরে বলিলেন—"তীর্থ পর্য্যটন কেন মা?"

প্রিয়ম্বদা। গুরুদেব! তীর্থপর্য্যটনত ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্ম।

প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া গুরুদেব নিস্তব্ধ হইলেন। তাহা দেখিয়া সুহাসিনীর বড়ই রাগ হইল। গুরুদেবও এক কথাতেই জল হইয়া গেলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া সুহাসিনী ছাড়িবে কেন? তখন সুহাসিনী বলিলেন—"বালাই ঈশ্বর অদৃষ্ট মন্দ করিয়াছেন বলিয়াই কি অমন কথা মুখে আনিতে আছে? তোমার অমন সোনার চাঁদ ছেলে ও মেয়ে থাকিতে তুমি ব্রহ্মচারিণী হইবে কেন?"

প্রিয়ম্বদা উত্তর করিল—"আমার স্বামী পরমব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, সেই জন্য আমি ব্রহ্মচারিণী।"

প্রিয়ম্বদার এই কথায় আহ্লাদিত হইয়া গুরুদেব তখন বলিলেন—"মা, তোমার তীর্থভ্রমণের আবশ্যক নাই; পৃথিবীর সকলতীর্থ একত্রিত করিলে তোমার পবিত্র হৃদয়ের সমতুল্য হইতে পারিবে না, যাহার এতদূর জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাহার আবার তীর্থপর্য্যটনের আবশ্যক কি?"

প্রিয়ম্বদা। জ্ঞানলাভ সহজেই হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যের দ্বারা সে জ্ঞানের পরীক্ষা না করিলে, সে জ্ঞানলাভ যে বৃথা হইল। স্ত্রীলোকে অন্তঃপুরের মধ্যে থাকিয়া কি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে গুরুদেব?

গুরুদেব আবার নিরস্ত হইলেন, এবং প্রিয়ম্বদার এইরূপ কথায় প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে মনে মনে বলিলেন—"আমার পরিশ্রম বৃথা হয় নাই।"

সুহাসিনী কিন্তু গুরুদেবের প্রফুল্লতার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। অন্য উপায় না দেখিয়া বলিল—"তোমার দাদাকে পত্র লিখি, তিনি আসিলে তবে সকলেই আমরা তোমার সঙ্গে যাইব।"

প্রিয়ম্বদা। আমার সঙ্গে তোমরা কেহই যাইতে পারিবে না, কারণ আমি পদব্রজে যাইব।

সুহাসিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"পদব্রজে কেন?"

প্রিয়। ব্রহ্মচারিণী পদব্রজেই তীর্থপর্য্যটনে গিয়া থাকে।

প্রিয়ম্বদার কথায় তখন সকলেই কিছুক্ষণ নিরব হইয়া রহিল। পরে গুরুদেব বলিলেন—"মা আমি সন্ন্যাসী, আমারও তীর্থপর্য্যটনে যাইবার ইচ্ছা আছে। আর কেহ তোমার সঙ্গে পদব্রজে যাইতে না পারুক, কিন্তু আমি পারিব।

পরদিন হরনাথ সরকার আসিলে সকল বিষয়ের ভার তাহাকে অর্পণ করিয়া রাত্রে গোপনে প্রিয়ম্বদা গুরুদেবের সহিত যাত্রা করিলেন। গোপনে যাত্রা না করিলে সে গ্রামত্যাগ করিয়া যাওয়া প্রিয়ম্বদার পক্ষে সহজ হইত না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থপর্য্যটনে।

প্রিয়ম্বদা তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন, পরিধানে একখানি গেরুয়া বসন সঙ্গে আরো ঐরূপ ২।১ খানি বস্ত্র মাত্র ছিল। এ অবস্থায় গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে ত্রিশূল প্রভৃতি না থাকিলে অঙ্গহীন হয় বটে, কিন্তু প্রিয়ম্বদা সেরূপ ব্যাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। দেহ কৃশাঙ্গ, কিন্তু বর্ণ চম্পকপুষ্পতুল্য, দেখিলে বোধ হয় যেন সেই ক্ষীণদেহের কোথা হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছে। পাকা স্বর্ণকে যেমন সহস্রবার অগ্নিতে পোড়াইলেও তাহার বর্ণের বৈলক্ষণ্য হয় না, সেইরূপ নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও প্রিয়ম্বদার মুখকান্তি কি জানি কেন নিষ্প্রভ নহে। প্রিয়ম্বদাকে এখন দেখিয়া সংসারের মানবী বলিয়া কখনই বিশ্বাস হয় না। অগ্রে পথপ্রদর্শক স্বয়ং গুরুদেব চলিয়াছেন, তাঁহার ও পরিধানে গেরুয়া বসন, মস্তক জটাভারাক্রান্ত, কণ্ঠবেষ্টিত রুদ্রাক্ষমালা সুপ্রশস্থ বক্ষে বিস্তৃত, হস্তে ভীষণ ত্রিশূল, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, এবং কোটিদেশে প্রিয়ম্বদা প্রদত্ত প্রচুর অর্থ লুকায়িত ছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কেবল শেষোক্ত কারণের জন্যই তিনি ত্রিশূল ও রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহারও কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন ছিল না। গুরুদেব যদিও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়াছেন, তথাচ তাঁহার দেহক্ষীণ নহে। সেই দীর্ঘাকৃতি পবিত্র দেহে বল যথেষ্ট ছিল,

কিন্তু সেই বলবান পুরুষকে দেখিলে কাহার মনে ভয়ের লেশ মাত্র হইত না,বরং ভক্তিরসে মন আর্দ্র হইয়া যাইত। গুরুদেব অগ্রে অগ্রে প্রিয়ম্বদাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিলেই যেন মনে হয় যে আজ স্বয়ং ভগবতী কি এক অপরূপ বেশে না জানি কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন এক স্বর্গীয় পুরুষকে মাত্র সঙ্গে লইয়া মর্ত্তলোকে আবির্ভাব হইয়াছেন।

পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে হাঁটিয়া যাইবার যে পথ ছিল, এখনও সেই পথ আছে বটে, কিন্তু সে পথের অবস্থা বড় শোচনীয় এবং বিপদসঙ্কুল, সেই কারণে গুরুদেব সে পথে না গিয়া গ্রামের মধ্যে দিয়া চলিয়া ছিলেন, প্রিয়ম্বদার তাহাতে আর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি দরিদ্র দেখিলেই যথা-সাধ্য অর্থ দান, রোগী দেখিলে গুরুদেবের আজ্ঞামতে ঔষধ ব্যবস্থা, একান্তচিত্তে সুশ্রূষা এবং অবস্থা বিশেষে পথ্যের ব্যয় পর্য্যন্ত দিতেন। এই সকল কারণে গ্রামে গ্রামে বড় একটা গোল উঠিয়াছিল, সে গোলের কথা পরে বলিতেছি।

গ্রামে গ্রামে একটা জনরব উঠিল যে বোধ হয় ভগবতী ছদ্মবেশে মর্ত্তে আবির্ভাব হইয়াছেন, তিনি দরিদ্র দেখিলেই অর্থদান করিতেছেন, রোগী দেখিলেই নিজহস্তে ঔষধ সেবন করাইতেছেন, আর যে কেহ নিকটে যাই-তেছে, তাহাকেই সুমিষ্ট কথায় মোহিত করিতেছেন। সে অপূর্ব্বরূপ কখন কেহ চক্ষে দেখে নাই, সে স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর কেহ কখন কর্ণে শোনে নাই. সেই-রূপ দয়ানুষ্ঠান মর্ত্তলোকে এই প্রথম, আর সেরূপ উচ্চনীচ সমজ্ঞান এ জগতে কখন সম্ভব হইতে পারে না। জনরবটা পল্লীগ্রামের নীচবংশীয় দরিদ্রদিগের কর্ত্তৃকই উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন এই জনরবটা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে লাগিল, তখন ক্রমেই তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। শেষে জনরব এইরূপ দাঁড়াইল, যে স্বয়ং ভগবতী (আর বোধ হয় নয়) মর্ত্তে আবির্ভাব হইয়াছেন, কে যাহা বর চাহিতেছে তাহাকেই সেই বর দিতেছেন, অর্থাৎ যে টাকা চাহিতেছে সে টাকাই পাইতেছে, যে মোহর চাহিতেছে, সে মোহর পাইতেছে, যে অলঙ্কার যাচিতেছে সে অলঙ্কার পাইতেছে, যে পুত্রকামনা করিতেছে, সে পুত্র পাইতেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখন গ্রামে গ্রামে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, আর বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই সেই অপূর্ব্ব ভগবতীরূপ দর্শনে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, তবে ইহার মধ্যে স্ত্রীলোক মহলেই বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছিল। কোন যুবতী জল আনিতে যাইতেছিল, ভগবতী দর্শন লাভ হইবে শুনিয়া আর তাহার জল আনা হইল না, শূন্য কলসী প্রাঙ্গনের মধ্যে রাখিয়াই দৌড়িল, কেহ রন্ধন করিতেছিল, তাহার রন্ধন করা হইল না, অর্দ্ধসিদ্ধ ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া দৌড়িল। কেহ সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতেছিল, আর বিলম্ব সহ্য হইল না, সেই অর্দ্ধভুক্ত রোরুদ্যমান সন্তানকে ফেলিয়াই দৌড়িল। কেহ বেশভূষা করিতেছিল, ভগবতী দর্শনলাভ হইবে শুনিয়া অর্দ্ধভূষিত হইয়াই দৌড়িল। যে যুবতী সে দিন স্বামীর উপরোধে ব্রাহ্মমন্দিরে বসিয়া নয়ন মুদিয়া একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া আসিয়াছিল, সে যুবতী ও আজ দৌড়িল।

বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে শুনিল সেই ভগবতীরূপ দর্শন করিতে চলিল। বালক বালিকারা চলিয়াছে, সকলকে যাইতে দেখিয়া, যুবক যুবতীরা চলিয়াছে কৌতুহলবশবর্ত্তী হইয়া এবং এইরূপ হুজুক ভাল বাসে বলিয়া আর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা চলিয়াছে, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা স্মরণ করিয়া,সুতরাং তাহারা দৌড়িয়া যাইতে পারিতেছিল না। তবে নব্যসম্প্রদায়ের কতকগুলি সুশিক্ষিত উপাধিকারী যুবক যাহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিয়া ছিল, কেবল ভগবতীর অমানুষিক রূপের কথা শুনিয়াই দেখিতে চলিয়াছিল, অন্যান্য অনেক যুবক যুবতীর হৃদয়ে তখন ধর্ম্মভাব ও মিশ্রিত ছিল।

তাহার পর ভগবতী যে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন, একথা ও গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইয়াছিল, সুতরাং অনেক রোগগ্রস্তব্যক্তি রোগ মুক্তলাভ আশায় সেই অসংখ্য জনস্রোতের মধ্যে মিশিতে লাগিল। অবস্থানুসারে কেহ পাল্কি করিয়া চলিল। কেহ ডুলি করিয়া চলিল, কেহ বা আত্মীয় স্বজনের স্কন্ধের উপর চলিল, আর কেহ কোনরূপ বাহনাভাবে সেই রোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ দেহ বহুকষ্টে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

এদিকে প্রিয়ম্বদা দরিদ্র দেখিলে যথাসাধ্য অর্থদান করিতেছিল, রোগী

দেখিলে গুরুদেবের প্রদত্ত অমোঘ ঔষধের দ্বারা অনেক কঠিন পীড়া আরো গ্য করিতেছিল। সে সকল কথা যে গ্রামে গ্রামে প্রচার হয়, সেরূপ ইচ্ছা প্রিয়ম্বদার একবারও মনে উদয় হয় নাই, অতি গোপনে তিনি এই সকল কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু সে সকল কথা গোপন থাকা দূরে থাকুক, অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়াছে শুনিলেন। ক্রমে প্রিয়ম্বদা দেখিল যে দলে দলে লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে, ধনী ও দরিদ্র সকলেই তাঁহার নিকট অর্থ কামনা করিতেছে, রোগী মাত্রেই বিনা ঔষধের সাহায্যে আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছে। সংসারে যাহার যে কিছু অভাব আছে, সকল অভাব পূরণের জন্য প্রিয়ম্বদাকে শত শত লোকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বড়ই চিন্তিত ও ভীত হইলেন, গুরুদেবকে অনুরোধ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া মাঠ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, সকলকে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার অমানুষিক কোন ক্ষমতাই নাই, তিনি একজন সামান্য ব্রহ্মচারিণী মাত্র। যদি কাহার কোন বিষয়ের জন্য কোনরূপ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা বা ভক্তি করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে সকল তাঁহার গুরুদেবেরই প্রাপ্য।

কিন্তু লোকের যে অন্ধ বিশ্বাস একবার হইয়াছিল, সহজে সে বিশ্বাস গেল না। প্রিয়ম্বদার সে সকল কথা যে শুনিল সেই আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিল। যে সময় প্রিয়ম্বদা গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাঠ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন, সেই সময়ই প্রিয়ম্বদার বিষয় বহুদূরে প্রচার হইয়াছিল, সেই সময়েই বালক, যুবক, বৃদ্ধ আর বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিতে আরম্ভ করিল। যে মাঠ দিয়া প্রিয়ম্বদা চলিতে আরম্ভ করিল, সেই মাঠ জনস্রোতে ভরিয়া যাইতে লাগিল। প্রিয়ম্বদা তখন আবার বড়ই চিন্তিত হইলেন। গুরুদেবকে বলিলেন—"প্রভো, ইহার উপায় কি? লোকের এ অন্ধ বিশ্বাস কিরূপে দূর হইবে।"

গুরুদেব। মা ভগবান তোমার প্রতি সদয়, তাহা না হইলে সহস্র সহস্র লোকের এরূপ অন্ধ বিশ্বাস হইবে কেন? তুমি কর্ম্মানুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়াছিলে এখন তোমার কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত।

প্রিয়। আমি ক্ষুদ্রা অবলা—তবে আমার গুরুর চরণে ভক্তি আছে, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

গুরু। মা, কেবল দরিদ্রকে ধনদান করিলে আর রোগীকে রোগমুক্ত করিলে পরোপকার করা হয় না। যথার্থ পরোপকার করিতে হইলে লোককে ধর্ম্মোপদেশও দিতে হইবে।

প্রিয়। প্রভু, আপনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে আমি আবার কি ধর্ম্মোপদেশ দিব?

গুরু। মা, দেখিতেছ না এই সহস্র সহস্র লোকের তোমার প্রতি কিরূপ অচলা ভক্তি হইয়াছে, এখন তোমার এক কথায় যে ফল হইবে, আমার লক্ষ কথায় তাহার অর্দ্ধেক ফল হইবে না।

তখন প্রিয়ম্বদা গুরুদেবের আজ্ঞায় মাঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সেই অসংখ্য সমাগত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। প্রিয়ম্বদার মুখনিঃসৃত একটি কথা উচ্চারিত হইবা মাত্র অকস্মাৎ সেই বহুজনসমাগমপূর্ণ জনতা নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইল। প্রিয়ম্বদা তখন রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। সে বক্তৃতার কি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু যে সেই উপদেশ শুনিল, তাহারই ধর্ম্মে মতি ফিরিল। সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইল। সর্ব্বশেষে প্রিয়ম্বদা সকলকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি একজন সামান্য ব্রহ্মচারিণী মাত্র. যাহা কিছু অনুষ্ঠান তিনি করিতে চেষ্টা করেন, সে সকল ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্মপালন মাত্র, সুতরাং তাহার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্রী নহেন। কোনরূপ অমানুষিক কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু আমরা ভালরূপ জানি কেবল শেষের এই কথায় অনেকের বিশ্বাস হইল না। এখন হইতে প্রিয়ম্বদা এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রত্যহ দিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রিয়ম্বদার তীর্থপর্য্যটন এইরূপে চলিতে লাগিল। শরীরের কষ্টকে কষ্ট বোধ হইত না, আলস্যতা হৃদয়ে স্থান পাইত না, একমুহূর্ত্তের জন্য ও উৎসাহের হ্রাস হয় নাই। কিন্তু এক বিষয়ের জন্য প্রিয়ম্বদা কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন, যে অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহাতে আর কুলান হয় না। তখন গুরুদেব তাহার এক উপায় স্থির করিলেন, ধনবানলোকের পীড়া আরোগ্য হইলে আবার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ দরিদ্রকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয়ম্বদার এইরূপ তীর্থ

পর্য্যাটনে তিনবৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। গয়া, কাশি, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোদ্ধা প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের সকল তীর্থ ভ্রমণ করা হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবস্থা পরিবর্ত্তন।

এ সংসার সুখের না দুঃখের? এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ ঠিক করিয়া দেওয়া যায় না। যদি বলি এ সংসার সুখের তবে আমাদের সাংসারিক দৈনিক ঘটনা তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, আর যদি বলি এ সংসার দুঃখের তাহা হইলেও প্রমাণ অভাব, কারণ সংসারের লোকে তবে ইহার মায়ায় মুগ্ধ হয় কেন? তবে লোকে ইচ্ছা করিয়া এই দুঃখ সাগরে ঝাঁপ দেয় কেন? আমাদের মতে "চক্র-বৎ পরিবর্ত্তন্তে" কথাটা মূল্যবানীয় বটে, এসংসারে সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নহে।

কালিঘাটের যে স্থানে আমরা ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়াছিলাম, এখন আর সে স্থানে ভগ্ন অট্টালিকা নাই, তৎপরিবর্ত্তে এক সুন্দর সৌধমালা শোভা পাইতেছে। তাহারই এক প্রকোষ্ঠে একজন যুবক আর একজন যুবতী বসিয়া গল্প করিতেছে। গল্প যে বিষয়েই হউক না কেন উভয়ে উভয়ের কথায় মোহিত হইয়াছিল। সংসারের কোন কথাই আর তাহাদের স্মরণ ছিল না, উভয়ে উভয়ের অস্তিত্ব ভিন্ন তখন অন্য কোন বিষয় আর মনে স্থান দিতে পারে নাই। এমন সময় সেই গৃহ মধ্যস্থ ঘড়িতে ঠং ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল; যুবতী ঘড়ির সেই শব্দ শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিল, কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার সতৃষ্ণনয়নে যুবকের প্রতি চাহিল, তাহার পর গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া বলিল—"তবে এখন আসি।"

যুবক তাহাতে যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল—"কেন।"

যুবতী। তিনটা বাজিয়া গেল, সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিব না—তোমার জন্য খাবার প্রস্তুত করিব না?

যুবক। সে সকল করিবার জন্য লোক আছে, এখন তোমার এত দাস দাসী রহিয়াছে, তবে তাহাদের কাজ তুমি করিবে কেন? আর যদি তাহাদের দ্বারা সকল কার্য্য না হইয়া উঠে, তবে আবশ্যক হইলে আরো লোক রাখিয়া দিতে পারি।

যুবতী। তবে আমার সংসারে আমি কিছুই করিব না? আজ যেন রবিবার, তুমি ঘরে আছ, তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার সেবা করিতে পারি, কিন্তু কাল হইতে যখন নয়টা না বাজিতে বাজিতে তুমি আফিসে চলিয়া যাইবে, তখন আমি একলা কি ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিব? আর আমাকে কি তুমি কুড়ে মনে কর?

যুবক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"কুড়ে মনে করিব কেন? তবে তুমি না কি এই বয়সে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ, সংসারে দাসীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর নষ্ট করিয়াছ, সেই জন্যই বলিতেছিলাম; আর এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের কিছুরই অভাব নাই, এখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলে আমার অর্থোপার্জ্জন সার্থক হইবে।

যুবতী তখন ধীরে ধীরে বসিল, মনের মধ্যে তখন তাহার কি একটা কথা তোলাপাড়া হইতেছিল, তাহাতেই যুবতী বসিল। বসিয়া বলিল—"দেখ, তোমাকে পাইলেই আমি সুখী হই, অর্থের দ্বারা আবার কি সুখ হইতে পারে তাহা আমি জানি না, আর জানিবার ইচ্ছাও আমার নাই। এখন এসকল কথা থাক্ যে লোক দিদির সংবাদ দিয়াছিল, তাহার আজ দেখা পাইয়াছিলে কি?"

যুবক। দেখা পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না, তিনি বলেন একজন ব্রহ্মচারিণীবেশে পশ্চিমাঞ্চলের সকল তীর্থে রোগীকে ঔষধ এবং সুশ্রুষা দ্বারা আরোগ্য করিতেছে, দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান করিতেছে, ধর্ম্মপিপাসুমাত্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছে, তাঁহার নাম প্রিয়ম্বদা এবং নিবাস কলিকাতারই নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইবে। প্রিয়ম্বদা যে এরূপ ব্রহ্মচারিণী-ব্রত অবলম্বন করিতে পারিয়াছে তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? তবে

এক কথায় মনে সন্দেহ হয় বটে, তিনি আরো বলিলেন তাঁহার সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী ও আছেন, ব্রহ্মচারিণী তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া ডাকেন। যাহা হউক এখন তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, পদব্রজে আসিতেছেন, বলিয়া এত বিলম্ব হইতেছে।

এখন যুবক যুবতীর পরিচয় আর কি আমাদের দিতে হইবে? তবে ধীরেন্দ্রের অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল, তাহা পরে প্রকাশ করিব। ধীরেন্দ্রের কথা শুনিয়া চপলা বলিল—"দিদিকে কত দিন দেখি নাই, দিদির জন্য প্রাণের ভিতর যে কি করে তাহা তোমায় আর কি করে বুঝাইব? আহা! কবে দিদির দেখা পাইব?"

ধীরেন্দ্র এ কথার উত্তরে একটি কথাও বলিল না বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল, একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরেন্দ্র সেই চক্ষের জল মুছিলেন। এই সময় শ্যামা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ছোট বাবু, বাহিরে কে একজন ভদ্র লোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

সুতরাং ধীরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বাহিরে যাইতে হইল, চপলা এই সুযোগে বলিল—"কেন, এখন যদি আমি তোমায় না ছাড়িয়া দিই।" ধীরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

ধীরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে উমাপুর হইতে রমানাথ বাবু আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ধীরেন্দ্র আহ্লাদে একবারে অধীর হইলেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

রমানাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"ধীরেন্দ্র, বহু অনুসন্ধানের পর আজ তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম, এখন আমি তোমার বিষয় সমস্তই অবগত আছি, গৃহ হইতে এখানে আসিয়া তুমি প্রথমে যেরূপ দারিদ্রযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলে এবং পরে ষ্ট্যানলি সাহেবের অনুগ্রহে তুমি যে তাঁহার আফিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছ, তাহাও আমি জানি। আজ কোন গুরুতর কার্য্যের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।

ধীরেন্দ্র। সে কথা পরে শুনিব, এখন আমাদিগের বাড়ির সংবাদ কি বলুন

দেখি। জ্যেঠা মহাশয়,বড় দাদা এবং বাড়ির অন্যান্য সকলে কিরূপ আছেন?

রমানাথ। সেই সকল কথা বলিতেই আমি আসিয়াছি, কিন্তু এরূপ ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ধীর হইয়া আমার সকল কথা শুন। তুমি চলিয়া আসিলে পর গুণীরাম খুড়োর কুমন্ত্রণায় তোমার জ্যেঠা মহাশয় আর হরকালি ভট্টাচার্য্যার সহিত মকর্দ্দমা বাধে, দাওয়ানি ফৌজদারী এবং শেষে খুন, জখম পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। চারি বৎসর ধরিয়া এই সকল মকর্দ্দমায় তোমার জ্যেঠা মহাশয়ের সমস্ত বিষয় মায় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি সস্ত্রীক ৺ কাশি বাস করিতেছেন। আজ ৪ দিবস হইল দুই হাজার টাকার ডিক্রির জন্য হরকালি ভট্টাচার্য্য মহেন্দ্রকে জেলে দিয়াছে।

অকস্মাৎ এই সকল দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ধীরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল,প্রথমে বিস্মিত নেত্রে রমানাথ বাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, শেষে তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না—বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। রমানাথ বাবু, ধীরেন্দ্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"সকলই অদৃষ্টের লিখন, তাহা না হইলে আর এরূপ হইবে কেন বল। কিন্তু পাপের উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে তোমার সকল বিষয়ে ফাঁকি দিতে গিয়া আপনারাই ফাঁকিতে পড়িয়াছে।

ধীরেন্দ্র। আমি আমার নিজের জন্য দুঃখ করি না,কিন্তু দুই হাজার টাকার দেনার জন্য দাদা আজ চারি দিন জেলে রহিয়াছেন, এ সংবাদে আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে, কোনরূপে যদি আমি এই সংবাদ পাইতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে জেলে যাইতে হইত না।

রমানাথ বাবু কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তবে তুমি তোমার দাদার ব্যবহার সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ।"

ধীরেন্দ্র। ভুলি নাই, কিন্তু এ সংবাদ পাইয়া কি আমি স্থির থাকিতে পারি? আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ তাহা না হইলে আমার দ্বারা জ্যেঠা মহাশয়ের কোন উপকারই হইল না।

রমা। তোমার অদৃষ্ট মন্দ নহে, তোমার অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন। আর এক সংবাদ আছে।

ধীরে। কি সংবাদ বলুন।

রমা। যিনি তোমাদিগের সমস্ত বিষয় খরিদ করিয়াছেন, তোমার নামে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

ধীরেন্দ্র। কত টাকায় বিষয় বিক্রি হইয়া গিয়াছে।

রমা। ত্রিশ হাজার টাকায়।

ধীরে। এত টাকা আমি কোথায় পাইব।

রমা। তোমার এক পয়সাও দিতে হইবে না।

ধীরে। এক পয়সা না লইয়া এত টাকার বিষয় আমায় দান করিবেন। সে মহাত্মা কে মহাশয়?

রমা। মহাত্মা নয়, সে আমি। কিন্তু ধীরেন্দ্র মনে করিয়া দেখ, তুমি একবার আমার অবাধ্য হইয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়াছ, এখন আবার আমার অবাধ্য হইবে কি? তুমি একটি কথা স্বীকার করিলে আমি তোমায় সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিতে পারি।

ধীরেন্দ্র রমানাথ বাবুর কথায় পুনরায় বিস্মিত হইল। মনে মনে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিল। তাহার পর চরণে ধরিয়া বলিল—"আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন, কিন্তু আপনার আমাকে এই সমস্ত বিষয় দান করিবার উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না। আর ইহার জন্য আপনার নিকট কি স্বীকার করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

রমা। ধীরেন্দ্র, তোমার পিতা আমার কিরূপ বন্ধু ছিলেন তাহা তুমি জান না, সে কথা তোমার জানা থাকিলে আজ আমার বিষয় দানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতে। যাহা হউক, আমি যে তোমার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী একথা তুমি কখন অবিশ্বাস করিও না। এখন আমার কথা শুন, তুমি এই সকল বিষয়ে মহেন্দ্রকে কোন ক্রমেই অংশ দিবে না স্বীকার কর, তাহা হইলেই আমি সমস্ত তোমায় লিখিয়া দিতে পারি। আমি তোমার চরিত্র বিলক্ষণ জানি সেই জন্যই এ কথার উত্থাপন করিলাম।

ধীরে। আপনার তাহাতে আপত্তি কি? আপনি আমার যেমন সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন, সেইরূপ দাদার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না কি?

রমা। আমি যেন ক্ষমা করিলাম, কিন্তু গ্রামের সকলে ক্ষমা করিবে কেন? মহেন্দ্র গ্রামশুদ্ধ লোককে বড়ই জ্বালাতন করিয়াছে।

ধীরে। আমি কল্যই দুই হাজার টাকা দিয়া দাদাকে জেল হইতে আনিব, প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট আমরা দুই ভাই গিয়া চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব—ইহাতে কি তাঁহাদের দয়া হইবে না?

রমা। দেখ ধীরেন্দ্র, তোমার জ্যেঠা মহাশয় এখন কাশিবাসী হইয়াছেন, তিনি আর যে গ্রামে ফিরিয়া আসিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি আর কাহার কোনরূপ বিদ্বেষ নাই; এখন তাঁহার উপযুক্ত সন্তান মহেন্দ্রের প্রতি সকলের আক্রোধ। পিতার অপরাধ ও এখন পুত্রের ঘাড়ে পড়িতেছে। আর গ্রামের লোকে তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিবে, কিন্তু তোমাকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া যে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, এ অপরাধের ক্ষমা করিতে পারিবে না। ধীরেন্দ্র, তুমি এ উপরোধ করিও না, বরং উপেন্দ্রের সন্তান সন্ততি লইয়া তুমি সমস্ত উপভোগ কর।

ধীরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি দাদাকে বঞ্চিত করিয়া সে বিষয় ভোগ করিতে পারিব না, আপনার দান আমি গ্রহণ করিব না, আমি যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতেই আমাদের সকলের ভরণপোষণ হইবে।

রমানাথ বাবু বিস্মিতনেত্রে ধীরেন্দ্রের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হৃষ্টমনে বলিলেন—"ধীরেন্দ্র, তোমার ন্যায় এরূপ উন্নতমন আমি কখনও দেখি নাই, শত্রুকে লোকে ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু শত্রুর উপকারের জন্য এতদূর ত্যাগ স্বীকার আমি কখন শুনিও নাই। তোমার নিকট কোন কথা আর গোপন করিব না, আমি তোমায় বিষয় দান করিতেছি না, তোমার স্বর্গীয় পিতা আমার নিকট এক সময়ে বিশ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাকে বাড়াইয়া ত্রিশ হাজার টাকার ও অধিক করিয়া রাখিয়াছি, তুমি উপযুক্ত হইলে তোমাকে ঐ টাকা দিবার মানস ছিল। এ কথা তোমার পিতা ভিন্ন আর কেহই জানে না, আমি সেই টাকাতেই এই বিষয় খরিদ করিয়াছি, সুতরাং আমি তোমায় বিষয় দান

করিতেছি না। আমি তোমার জন্য এতদূর করিলাম, তুমি অন্তত আমার এই উপরোধ রাখ। বাস্তবাড়ি, বাগান, পুখুর ইত্যাদি সাধারণের থাকুক, কেবল জমিদারী কয়েকখানা তোমারই নামে আমি লিখিয়া দিই। তুমি তাহার আয় হইতে তোমার জেঠা মহাশয়কে খরচ পাঠাইয়া দাও, মহেন্দ্রের সাংসারিক সমস্ত খরচ পত্র দাও। আর উপেন্দ্রের পুত্র কন্যাকে যে তুমি আপন পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ কর তাহা আমি জানি, সুতরাং তাহাদের বিষয় আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তাহা হইলেই সকলদিক বজায় রহিল।

ধীরে। আপনার এ কথায় অবাধ্য হইতে আমি পারিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর রমানাথ বাবু বিদায় লইবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ধীরেন্দ্র তাঁহাকে কোন ক্রমেই ছাড়িয়া দিলেন না।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বহুদিনের পরে।

এখন ধীরেন্দ্রের অবস্থা কিরূপে উন্নত হইল বলি শুন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ধীরেন্দ্র আপনার অবস্থার উন্নতিচেষ্টা সর্ব্বদাই প্রাণপণে করিত। ঘটনাক্রমে এই সময় ষ্ট্যানলে সাহেবের সহিত এক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কলিকাতা সহরে এক নূতন সওদাগরী আফিস খুলিতেছিলেন, ধীরেন্দ্রের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া এবং ধীরেন্দ্রের নিকট তাহার অবস্থার বিষয় শুনিয়া ষ্ট্যানলে সাহেবের ধীরেন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হইল। তখন সাহেবের কাজ কর্ম্ম মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আফিসের কাজ কর্ম্ম অধিক ছিল না, সাহেব ধীরেন্দ্রকে নিজ হস্তে হিসাব রাখিবার নিয়মাদি শিখাইতে লাগিলেন, ধীরেন্দ্র বিশেষ যত্নের সহিত অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্তই

শিখিয়া ফেলিতে লাগিল। ইংরাজের অদৃষ্টের প্রতি লক্ষ্মী সর্ব্বদাই প্রসন্না, সুতরাং এক বৎসর পরেই ষ্ট্যানলে সাহেবের কাজ কর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইল। তখন একে একে অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু প্রথম হইতেই ধীরেন্দ্র তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন। আমরা আরো অনুসন্ধানে জানিয়াছি, যে ষ্ট্যানলে সাহেব তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, যে তাঁহার ব্যবসার এত শীঘ্র উন্নতি হইবার ধীরেন্দ্রই মূল। এখন ধীরেন্দ্র ৩০০ শত টাকা বেতন পাইতেন, এবং ধর্ম্ম পথে থাকিয়া অন্য রকমে (প্রভুর অজ্ঞাতসারে নহে) আরো ২০০।১০০ শত টাকা উপায় করিতেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মহেন্দ্রকে জেল হইতে মুক্ত করাই ধীরেন্দ্রের প্রধান কার্য্য হইল। বেলা নয়টা বাজিবা মাত্র ধীরেন্দ্র আহারাদি না করিয়া তাড়াতাড়ি আফিসে গিয়া সাহেবের নিকট ছুটি লইয়া মহেন্দ্রকে আনিতে চলিয়া গেল। দেনার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া ধীরেন্দ্র মহেন্দ্রকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া আপন গৃহে আনিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই দুই ভাই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল, উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল, কেহই তখন একটিও কথা কহিতে পারিল না।

মহেন্দ্র বাড়িতে আসিলে চপলার আনন্দের সীমা ছিল না, চপলার অনুরোধে তখনি কালিমাতার পূজার ধুম পড়িয়া গেল, তখন ও কেহ স্নানাহার পর্য্যন্ত করে নাই, মহেন্দ্র আসিলে পূজার সামগ্রী লইয়া মন্দিরে চলিল। ধীরেন্দ্র ও রমানাথ বাবু চপলার উপর পূজার আয়োজনের সমস্ত ভার দিয়া মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া অগ্রেই কালিবাড়িতে পৌঁছিল। আজ মন্দিরের চারি দিকে ভয়ঙ্কর লোকের জনতা হইয়াছিল। কেহ পূজার জন্য আসিয়াছিল, কেহ ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিল, কেহ বা আপনার কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসিয়াছিল কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এক স্থলে ভয়ানক ভিড় দেখা গেল। পরস্পরের নিকট শুনা গেল যে একজন অপূর্ব্ব ব্রহ্মচারিণী কি ভৈরবী বা যোগিনী এই খানে দরিদ্রকে ধন দান করিতেছেন, পীড়িতকে ঔষধ দান করিতেছেন, আর সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। এইরূপ জনরব শুনিয়া ধীরেন্দ্র, মহেন্দ্র এবং রমানাথ বাবুর তাঁহাকে দেখিতে বড়ই কৌতুহল জন্মাইল। সকলেই

আগ্রহের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বহু কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অপূর্ব্ব মুর্ত্তি দেখিল। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া রহিল, তাহার পর আর পারিল না। ধীরে ধীরে ধীরে ধীরেন্দ্র সেই ব্রহ্মচারিণীর পদতলে মুর্চ্ছিতাবস্থায় লুটাইয়া পড়িল। ব্রহ্মচারিণী ও একটি কথা কহিল না, সস্নেহে ধীরেন্দ্রের মস্তক আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলই আশ্চর্য্য হইল। এমন কি মহেন্দ্র এবং রমানাথ বাবু পর্য্যন্ত ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। এই সময় একজন ব্রহ্মচারী একজন অষ্টম বৎসরের বালক এবং এক দশম বর্ষীয়া বালিকা সঙ্গে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক ও আসিয়াছিল। ক্রমে ধীরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইল, ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং সেই বালকবালিকাদ্বয়ের মুখ চুম্বন করিল। তখন মহেন্দ্র এবং রমানাথ বাবু জানিতে পারিলেন যে ব্রহ্মচারিণী অন্য কেহ নহে, তাঁহাদেরই প্রিয়ম্বদা আর এই বালক বালিকা তাহারই পুত্র কন্যা দেবপ্রসাদ এবং সরোজিনী। সকলেই আনন্দে অধীর হইল। এখন মহেন্দ্রের চরিত্রের ও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে!

ব্রহ্মচারী প্রিয়ম্বদারই গুরুদেব, তাঁহার সঙ্গে যে স্ত্রী পুরুষ আসিয়াছিল, তাহারাও পাঠকগণের বিশেষ পরিচিত। পুরুষের নাম বীরেশ্বর আর স্ত্রীলোকের নাম সুহাসিনী। ইহারা প্রিয়ম্বদার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সংবাদ পূর্ব্বেই গুরুদেবের পত্রে জানিতে পারিয়াছিল, সেই জন্য দেবপ্রসাদ এবং সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়ম্বদার আগমন প্রতীক্ষায় কলিকাতায় বসিয়াছিল। আজ দুই দিবস হইল, তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া পেঁ ৗছিয়াছেন, অদ্য কালি দর্শন করিয়া কলাই বসন্তনগরে রওনা হইবেন, এইরূপ স্থির ছিল। তবে বীরেশ্বর বাবু যে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হইয়া কালিঘাটে কালি দর্শন করিতে আসিয়াছেন তাহার ও কারণ আছে। গুরুদেব এবং প্রিয়ম্বদার নিকট একদিন মাত্র ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া বীরেশ্বরের পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং ভক্তি জন্মিয়াছে।

যখন সকলেই পরস্পরের পরিচয় পাইয়া আনন্দ করিতেছিল, সেই সময় চপলা শ্যামা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পূজা দিতে আসিতেছিল। তথায় উপস্থিত হইয়াই এই সকল অপূর্ব্ব ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করিল, আজ আর চপলার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে আর কত আনন্দ ধরিবে? চপলা আনন্দে পূজার আয়োজন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। সকলে মিলিয়া ভক্তিভাবে ধুমধামের সহিত সেই দিন পূজা শেষ করিল। পূজা শেষ হইয়া গেলে সকলকেই ধীরেন্দ্র আপন গৃহে আনিল। আসিবার সময় রাস্তার ধারে এক জন ব্যাধিগ্রস্ত অন্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতেছিল, রমানাথ বাবু ইঙ্গিতের দ্বারা মহেন্দ্রকে তাহাকে দেখাইয়া কানে কানে বলিলেন—"তোমার গুণীরাম খুড়োর কিরূপ অবস্থা হইয়াছে দেখ।" মহেন্দ্র গুণীরামের নাম শুনিয়া ঘৃণার চক্ষে সেই দিকে চাহিল, কিন্তু পাছে তাহার সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কাহার মনে দয়ার উদয় হয়, সেই জন্য আর সে বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করিল না। রাস্তার উপরেই ধীরেন্দ্রের গাড়ী ছিল, স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগকে সেই গাড়িতে উঠিতে বলা হইল, কিন্তু প্রিয়ম্বদা গাড়িতে উঠিতে স্বীকৃত হইল না, সুতরাং চপলা সুহাসিনী এবং বালক বালিকারাও গাড়িতে উঠিল না, সকলেই পদব্রজে চলিল। ধীরেন্দ্রের বাড়ি মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর, এবং সেই জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্র, কিন্তু আজ আর ইহাতে কাহার কষ্টবোধ হইল না, সকলেই মনের আনন্দে পথ হাঁটিয়া ধীরেন্দ্রের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পর দিন ধীরেন্দ্র আফিস হইতে এক মাসের ছুটী লইয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া উমীপুরে চলিলেন। গুরুদেব ও সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। বহুদিনের পরে পুনরায় আবার সকলে একত্রিত হইল। ধীরেন্দ্র এবং প্রিয়ম্বদাকে পাইয়া উমীপুরবাসীর আর আনন্দের সীমা ছিল না। অনেকে সেই দিন রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে নাই।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রেম পরীক্ষা।

ধীরেন্দ্র উমীপুর পৌঁছিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, যে যেরূপ লোক তাঁহাকে সেইরূপ সম্মান এবং সদালাপের দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন ধীরেন্দ্রের কথা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ অন্দোলন হইতে লাগিল, সকলেই একবাক্যে ধীরেন্দ্রের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। ধীরেন্দ্র তাহার পর বিশেষ ভক্তি এবং সম্মানের সহিত তাঁহার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়কে কাশীধামে এক পত্র লিখিলেন, এবং মহেন্দ্রকেও এক পত্র লিখিতে বলিলেন। উভয় পত্রেই তাঁহাকে সস্ত্রীক পুনরায় উমীপুরে কিছু দিনের জন্য একবার আসিতে বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা এ বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরিয়া আসিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা ধীরেন্দ্র তাঁহার খরচ পত্রের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। উমীপুরের বাড়ি এবং বাগান প্রভৃতির অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। ধীরেন্দ্র একে একে সেই সমস্ত সংস্কার করিলেন। এবার সেই বাড়ির শোভা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। এত দিন কোন প্রতিবাসী সে বাড়িতে আসিত না, এখন আবার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আহ্লাদের সহিত আসিতে আরম্ভ করিল। এখন সকলি যেন নূতন হইল।

প্রিয়ম্বদা কিন্তু সে বাড়িতে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কারণ সে বাড়িতে থাকিতে গেলে প্রিয়ম্বদার জীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। বাড়ির পূর্ব্বাংশে যে একখানি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান ছিল, প্রিয়ম্বদার অনুরোধে সেই খানে ধীরেন্দ্র এক কুঠির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই পুষ্পোদ্যানের ফুলগাছ গুলি উপেন্দ্র স্বহস্তে রোপণ করিয়া ছিলেন। এখন তাহাদের অনেক ফুলগাছই যত্নাভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কুঠির নির্ম্মাণ হইলে প্রিয়ম্বদা তথায় গিয়া বাস করিলেন, এবং যে সকল ফুলগাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের স্থানে স্বহস্তে সেই সেই ফুলগাছ বসাইয়া দিলেন। প্রিয়ম্বদার যত্নে শীঘ্রই সেই ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে জাঁতি, জুঁতি, বেল, মল্লিকা, গোলাপ, চামেলি প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া সেই স্থান আলোকিত এবং সৌগন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল।

প্রিয়ম্বদা এই স্থানে বাস করিয়া দেবার্চ্চনা করিত। কিন্তু প্রিয়ম্বদা কোন্ দেবতার উপাসক ছিল তাহা কেহ জানিত না। আর তাহার জীবনের যে ব্রত ছিল তাহাও সযত্নে পালন করিত। প্রিয়ম্বদাকে এরূপ স্থানে বাস করিতে দেখিয়া কেহ মনে না করেন যে তিনি সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। বাস্তবিক প্রিয়ম্বদা সময়ে সময়ে সংসারীও হইত,তাহার দেবপ্রসাদ ও সারোজিনী সেই কুঠিরে বাস না করিলেও সময়ে সময়ে প্রিয়ম্বদা তাহাদিগকে দেখিতে যাইত, তাহারাও জননীকে দেখিতে আসিত। ইহা ব্যতীত প্রিয়ম্বদা এখনও চপলা, সুহাসিনী প্রভৃতি এবং এমন কি অনেক নীচবংশীয়া গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিগের সহিতও কথাবার্ত্তায় বিশেষ আহ্লাদ বোধ করিত। এবং সকলকেই সৎপরামর্শ দিত।

এক দিন বৈকালে সুহাসিনী, চপলা এবং প্রিয়ম্বদা একত্রে বসিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল। তখন বীরেশ্বর বাবু দুই সপ্তাহ হইল দেশে চলিয়া গিয়াছেন, সুহাসিনীকে তাঁহার সঙ্গে ছাড়িয়া দিতে সে সময় কাহার মত হয় নাই। সুহাসিনীর এত শীঘ্র সকলকে ছাড়িয়া যাইতেও মত ছিল না। কারণ সুহাসিনী দুই দিন কোথায় থাকিতে পাইলে, সেখানকার সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু আজ সুহাসিনীর আসন টলিয়াছে। সুহাসিনী এ কথা সে কথা কহিয়া বলিল—"আজ ঠিক এক মাস হইল, প্রিয়ম্বদার পত্র পাইয়া বসন্তনগর হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, আর তিন সপ্তাহ হইল এই উমাপুরে বসিয়াছি।"

তখন চপলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আর দুই সপ্তাহ হইল, দাদার সহিত ছাড়াছাড়ি।

সুহা। তাহার জন্য ভেবে ভেবেত আমার ঘুম ও হয় না।

প্রিয়। ঘুম না হইবারইত কথা দিদি, আমাদের জন্য তুমি কত কষ্টই সহ্য কর, তোমার ঋণ কি এ জীবনে কখন পরিশোধ করিতে পারিব?

সুহা। কেন প্রিয়ম্বদা, তুমিত জান তোমার দাদাত চিরকালই বিদেশে থাকেন।

চপলা। হাঁ দিদি, তবে আমাদের এখানে এখন কিছু দিন থাকিবে?

সুহা। হাঁ থাকিব বই কি, আজিকার রাত্র পর্য্যন্ত।

কথাটা চপলার মনের মতন হইল না, চপলা একবার প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে মুখ খানিতে অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইল না। চপলা কি বলিতে যাইতে ছিল কিন্তু এই সময় আর একজন স্ত্রীলোক সেখানে আসিল। এই স্ত্রীলোক অন্য কেহ নহে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শশিকলা। এই সময় শশিকলার বিষয় দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। রামগোপালের যখন দিন দিন অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল, তখন শশিকলা আর শ্বশুরালয়ে থাকিত ইচ্ছা করিল না, মহেন্দ্র পিতার সেবা কে করিবে বলিয়া অনেক বুঝাইল। কিন্তু শশিকলা কাহার কথা শুনিল না, পাছে এই দুরাবস্থার সময় তাহার অলঙ্কার গুলি নষ্ট হয়, সেই ভয়ে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া নিজে এক মাত্র চাকর সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, ভ্রাতা কুচরিত্র, মদে এবং বেশ্যায় সমস্ত বিষয় নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক দিন রাত্রে শশিকলার সমস্ত অলঙ্কার তাহার ভ্রাতা অপহরণ করিয়া আত্মসাৎ করিল, শশিকলা মনের দুঃখে গলায় দড়ি পর্য্যন্ত দিতে গিয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেন তাহাতেও শশিকলার মৃত্যু হয় নাই। ধীরেন্দ্র ও মহেন্দ্র প্রভৃতি উমীপুরে আসিলে শশিকলাকে পিত্রালয় হইতে আনা হয়। শশিকলার অলঙ্কার নাই দেখিয়া চপলা স্বহস্তে আপনার অনেক মূল্যবান্ অলঙ্কার শশিকলাকে পরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু শশিকলা সেই সময় বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিয়াছিল। মহেন্দ্রের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু শশিকলার স্বভাব আর ইহ জন্মে পরিবর্ত্তন হইবার নহে। এখন কাহাকে কোন কথা মুখে বলিতে পারিত না, কিন্তু আপনার মনের আগুণে আপনি পুড়িত।

শশিকলা আসিলেই সকলই তাহাকে বসিতে বলিল। শশিকলা চপলা প্রভৃতির প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিতে কয়দিনের মধ্যে কেহ দেখে নাই, কিন্তু আজ সে অনুগ্রহ হইল। তখন তাহাদের পূর্ব্বের কথা পুনরায় চলিতে লাগিল। চপলা বলিল—"দিদি, ইহা তামাসা না সত্য?"

স্বহা। কি তামাসা না সত্য বোন্?

চপলা। এই তুমি কাল সকালে আমাদের ছাড়িয়া যাইবে?

সুহা। এ কথা কি মিথ্যা হয়। তুই পোড়ারমুখি, আমায় মনে করিয়া দিলি কেন?

চপলার চক্ষু দুইটি একটু ছল ছল করিতে লাগিল, সেই ছল ছল চক্ষেই বলিল—"তোমায় যাইতে দিতে পারি না, তুমি এত অল্প দিনের মধ্যে এত অধিক ভাল বাসিলে কেন?"

সুহাসিনী আর কথা কহিল না, সস্নেহে একবার চপলার মুখ চুম্বন করিল। শশিকলা তখন সুহাসিনীকে বলিল—"বীরেশ্বর বাবু তোমার অবাধ্য হইয়া এখান হইতে চলিয়া গেলেন, এইত তাঁহার তোমার প্রতি ভাল-বাসা! যে স্বামী স্ত্রীর কথা শুনিবে না, তাহার আবার কিসের ভালবাসা?

সুহা। আমার স্বামীর ন্যায় স্ত্রীকে ভালবাসিতে কাহার স্বামী জানে না।

শশি। এ অহঙ্কার করা ভাই, তোমার অন্যায়, আর কিসে যে অহঙ্কার কর তাহা বুঝিতে পারি না।

সুহা। স্ত্রীলোক মাত্রেই এ অহঙ্কার করিতে পারে। কেমন চপলা তুমি কি বল?

চপলা। দিদি, স্বামীর ভালবাসার আবার অহঙ্কার কি তাহা জানি না। যাহা না পাইলে স্ত্রীলোকের জীবনই বৃথা, তাহা পাইয়া আবার অহঙ্কার কি করিব? আরো দেখ, দিদি, সে ভালবাসা কি অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারা যায়—না তাহার পরিমাণ করিতে পারা যায়?

চপলা আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই সময় প্রিয়ম্বদার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল অন্য কথা না বলিয়া চপলা প্রিয়ম্বদাকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি তোমার কি মত।"

প্রিয়ম্বদা বলিল—"আমার আর মত কি বোন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে টুকু বুঝিয়াছি তাহা বলি শুন। স্বামী বাধ্যই হউন আর অবাধ্যই হউন, স্ত্রী তাঁহাকে ভালবাসিবে এবং ভক্তি করিবে। স্বামীর রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি না থাকিলেও স্ত্রীর পক্ষে স্বামী দেবতার স্বরূপ। যে স্বামীকে যথার্থ ভালবাসে সে কুরূপ স্বামীকে রূপবান দেখিবে, মূর্খ স্বামীকে বিদ্বান দেখিবে, নির্ব্বোধ স্বামীকে বুদ্ধিমান দেখিবে। স্বামীকে ভালবাসাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম সুতরাং সে ভালবাসার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা করিতে নাই। যে ভালবাসায়

স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়, সে ভালবাসাকে আবার স্বার্থ মিশ্রিত করিয়া কলঙ্কিত করা কেন? স্বামী ভাল বাসিবে, আদর করিবে, সোহাগ করিবে, এই সকল আশা করিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে নাই, তিনি ভালবাসুন আর না বাসুন স্ত্রীর যেন তাঁহার প্রতি ভক্তি অচলা থাকে।

শশি। স্বামী ভাল না বাসিলে তাহাকে কি আবার ভক্তি করা যায়? তোমার কেমন কথা ছোট বউ। আমিত প্রাণ থাকিতে পারি না, বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব সে ভাল তবু অমন স্বামীর মুখ দেখি না।

উপলা। স্বামীকে কি ও কথা বলিতে আছে দিদি? বরং তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে হয়, যাহাতে তাঁহার ভালবাসা জন্মায় তাহার উপায় করিতে হয়।

সুহা। আমিত চরণে ধরিয়া কাঁদিতে পারি না। আমার ভালবাসা যদি যথার্থ হয়, তবে এ ভালবাসা বৃথা হইবে না, ইহার প্রতিদান নিশ্চয়ই পাইব। এইত আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় তাহাদের হৃদয়ের প্রেমপরীক্ষা হইয়া গেল। পরদিন সুহাসিনী বসন্তনগর চলিয়া গেল, কিন্তু যাইবার সময় সংবাদ পাইবা মাত্র আর এক দিন প্রিয়ম্বদাকে দেখিতে আসিবে স্বীকৃতা হইয়া যাইতে হইয়াছিল। ধীরেন্দ্র বাবুর ছুটী শেষ হইয়া গেলে তিনি আপনার বিষয়াদির এবং প্রিয়ম্বদা পিতার বিষয় সকলের বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার সময় দেবপ্রসাদকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া নিলেন। শ্যামাকেও সঙ্গে যাইতে হইয়াছিল, কারণ চপলার অবর্ত্তমানে দেবপ্রসাদ ও ধীরেন্দ্রকে যত্ন করিবে কে?

শেষ কথা।

প্রতিমা প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় বার বৎসর অতীত হইয়াছে। দেবপ্রসাদ এখন মাতামহের সমস্ত সম্পত্তির ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সরো-

জিনীকে একজন সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করা হইয়াছে। বৃদ্ধ রামগোপাল এবং তাঁহার স্ত্রী আজ দুই বৎসর হইল ৺ কাশি প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধে ধীরেন্দ্রের এবং মহেন্দ্রের বিস্তর টাকা খরচ হইয়াছিল। মহেন্দ্র এখন বাড়িতে থাকিয়া সকল বিষয় কর্ত্তৃত্ব করেন, এবং ধীরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন আছে। শশিকলা এখনও সেই শশিকলা, কিন্তু মহেন্দ্র এখন আর তাহার ভয়ে ভীত নহে, বরং দিবা রাত্র তিরস্কার করিত। চপলা যত্ন না করিলে বোধ হয় শশিকলা এতদিন আত্মঘাতিনী হইত। সুতরাং শশিকলার জীবনে আর সুখ নাই। ধীরেন্দ্রের প্রতি কমলার বিশেষ কৃপা হইয়াছে। ধীরেন্দ্র এখন ষ্ট্যানলিকোম্পানির একজন অংশীদার হইয়াছেন। আর প্রিয়ম্বদার কথা আর কি বলিব? যে পরপোকার ব্রতে প্রিয়ম্বদা আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সেই মহাব্রতেই আপনার জীবনকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছে প্রিয়ম্বদার জীবন প্রদীপ এমন নির্ব্বানোন্মুখ। প্রিয়ম্বদা নিজে তাহা জানিতে পারিয়াছিল। পূর্ব্বেই সকলকে সংবাদ দেওয়া হইল।

যথা সময়ে ধীরেন্দ্র, দেবপ্রসাদ, সরোজিনী, সুহাসিনী, বীরেশ্বর, প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুদেবকে যদিও সংবাদ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তিনিও যথা সময় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই আর প্রিয়ম্বদাকে এ পৃথিবীতে রাখিতে পারিল না। একে একে যে দিন সকলে আসিয়া পৌঁছি সকলেই সজলনেত্রে জন্মের মত সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিতে ছিল, এমন কি অভদ্র গ্রামশুদ্ধ লোকে যে দিন সেই ক্ষুদ্র উদ্যান পরিপুর্ণ হইয়া গিয়া সেই দিন হাসিতে হাসিতে প্রিয়ম্বদা স্বর্গারোহণ করিলেন। ৪।৫ খানি গ্রা প্রায় দুই সহস্র লোকে একত্রিত হইয়া প্রিয়ম্বদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পা করিতে চলিল।

শশ্মানে আর লোক ধরে না, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই আজ শশ্মানে, সকলেরই চক্ষু আজ অশ্রুপূর্ণ। এই পবিত্র ভূমিতে ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই আজ এক অবস্থাপন্ন—কাহার মুখে আর কথা নাই। অচিরেই চিতা সজ্জিত হইল, দেবপ্রসাদ পুত্রের শেষ কার্য্য করিল। সকলেই আগ্রহের সহিত তখন জন্মের মত সেই মৃত দেহ দেখিতে গেল, কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইল, সে মুখে মৃত্যুর কোন লক্ষণই

দেখিতে পাওয়া গেল না, তখনও যেনসেই মুখ প্রফুল্ল, আর মৃতদেহের সেরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ যে অসম্ভব একথাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

পর দিন ধীরেন্দ্র প্রিয়ম্বদার কুঠির ভগ্ন করিয়া তাহার উপর এক সুন্দর মন্দির প্রস্তত করিতে অনুমতি করিলেন। মন্দির প্রস্তুত হইলে সেই মন্দিরে এক সুবর্ণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অতি সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবং বাৎসরিক বার হাজার টাকা আয়ের এক একখানি জমীদারি সেই প্রতিমার সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য লিখিয়া দিলেন। মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ অতিথিশালাও নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। প্রত্যহ চারি পাঁচ শত দরিদ্র লোকে যাহাতে ভোগের অন্ন আহার করিতে পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রতিমা পূজার অন্য কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। আর মন্দিরের দ্বারের উপর বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল—প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা।

সম্পূর্ণ।

প্রেম প্রতিমা।

বা

প্রিয়ম্বদা।

(সামাজিক উপন্যাস।)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্—মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ও

১৩৪নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউক্যানিং প্রেসে

[illegible]লিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

উপহার।

—•—

সোদরসদৃশ শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
মান্যবরেষু।

দাদা,

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতাপূর্ণ বঙ্গভূমে আমার এই "প্রেম প্রতিমার" আদর হইবে কি না জানি না, সেই জন্য এত দিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহাকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু "কল্পনায়" ইহার যে কয়েক পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে এই পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে আমায় অনুরোধ করায় ইহা এক্ষণে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এখন জানি না এই অপরিণামদর্শীতার ফল আমার অদৃষ্টে কি হইবে। তবে তোমার প্রেমময় হৃদয়ে এই "প্রেমপ্রতিমা" স্থান পাইতে পারে, এই বিশ্বাস আছে বলিয়া আজ আমার 'প্রিয়ম্বদাকে' তোমার করে সমর্পণ করিলাম। ইতি—

তোমারই স্নেহাস্পদ
যোগেন্দ্র।